জুলাই ২০০৬ • দশ টাকা

আনন্দমেলা

শিবরাম চক্রবর্তীর গল্পের দমফাটা হাসির কমিক্‌স

আমার সম্পাদক শিকার

জমজমাট সম্পূর্ণ উপন্যাস প্রথমাংশ

শিকারবাড়ি রহস্য

আনন্দমেলা ক্লাবের সামার ক্যাম্প

চারটি দুর্দান্ত গল্প

এবার যাঁদের শেষ বিশ্বকাপ

১৪টি গোল্ডেন গোল রোনাল্ডোর

আমরা জানি বাচ্চারা তরিতরকারী পুরোটা খায় না।
তাই, আমাদের পুষ্টি সম্পূরকে আমরা ভরে রেখেছি প্রকৃতির গুণাবলীকে।

এ প্রমাণিত। জৈবিক ভাবে ফলানো খাদ্যশষ্যে শ্রেষ্ঠতম পুষ্টিগত ফলাফল পাওয়া যায়। আর সেজন্যেই তো অ্যামওয়েতে, আমরা আমাদের খাদ্য সম্পূরক গুলিকে তৈরী করি একেবারে সরাসরি ক্ষেত থেকে আনা প্রকৃতি থেকে। আমরা যে সব উপাদান ব্যবহার করি সেগুলি ফলানো হয় আমাদের-নিজস্ব জৈবিক খামারে, যেখানে মাটি চাষ করে কেঁচো এবং গুবরে-পোকা জাতীয় পতঙ্গ কাজ করে কীটনাশকের। বস্তুত্ব, নিরাপদ এবং প্রাকৃতিক এই দুটি শব্দই আমরা উত্তরোত্তর বহন করে চলি আমাদের উৎপাদনের সমস্ত সম্ভারের গোড়ার কথা হিসেবে। আমাদের সংক্রমণ নিরোধক এবং হাউসহোল্ড ক্লীনার গুলিতে থাকে কেবলমাত্র ত্বক-নিরাপদ উপাদান। আমাদের ফ্লোর ক্লীনার গুলিতে থাকে পাঁচবার ফিল্টার করা জল যা সচরাচর ব্যবহার করা হয় কফ সিরাপে। আমাদের উৎপাদনগুলি সৃষ্টি করা হয় 500-এরও বেশি উচ্চশিক্ষিত বিজ্ঞানীদের দল দ্বারা। এ সব জিনিষ আপনি স্থানীয় মুদি-দোকানে কোনদিনই দেখতে পাবেন না। অ্যামওয়ের কোন দোকান নেই, নেই কোন দোকানদারও। আছেন একগুচ্ছ মানুষ, যাঁরা তাঁদেরই মত স্বমতাবলম্বী কিছু মানুষ কে তাঁদের গোষ্ঠীতে নিয়ে আসেন। আপনার মত মানুষদের। আরও বিশদ ভাবে আমাদের সম্বন্ধে জানতে লগ অন করুন www.amwayindia.com

CUSTOMER SATISFACTION 100% OR MONEY REFUNDED

•Nutrition & Wellness •Cosmetics •Home Care •Personal Care •Insurance | www.amwayindia.com

Amway™
BETTER iDeaS. BETTER LiFe.

আনন্দমেলা
৩২ বর্ষ ৩ সংখ্যা আষাঢ় ১৪১৩ জুলাই ২০০৬

শিবরাম চক্রবর্তীর গল্পের মজাদার কমিক্‌স

আমার সম্পাদক শিকার ১৭

'বিচিত্র সাহিত্য মণ্ডলী'র পক্ষ থেকে সংবর্ধনা দেওয়া হল বিশিষ্ট সাহিত্যিক দোলগোবিন্দ সরখেলকে। নবীন লেখক শিবরাম চক্রবর্তী একটি লেখা নিয়ে তাঁর সামনে হাজির। তিনি লেখা না পড়েই আশীর্বাদ করলেন। এবার শিবরাম পত্রিকায় লেখা পাঠাতে শুরু করলেন। সব পত্রিকা থেকেই তাঁর লেখা ফেরত আসতে লাগল। এর পর কী করলেন শিবরাম? দু' সংখ্যায় সমাপ্য রঙিন কমিক্‌স-এর প্রথমাংশ এই সংখ্যায়।

ছবি: সৌরভ মুখোপাধ্যায়

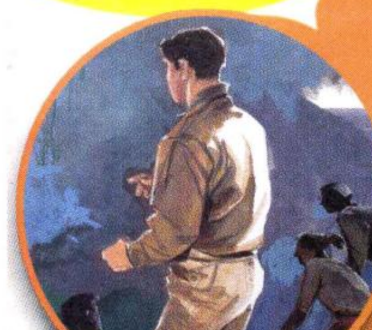

শিকারবাড়ি রহস্য ২৮

সম্পূর্ণ রহস্য উপন্যাস (প্রথমাংশ)

শুভমানস ঘোষ

সন্ধের মুখে 'সৃষ্টিছাড়া অ্যাডভেঞ্চার ক্লাব'-এর সদস্যরা এসে পৌঁছল পাহাড়-জঙ্গলে ঘেরা লালতটিতে নতুন অ্যাডভেঞ্চারে। সৌমিতা, তার ভাই তাতান, বাবলি, পপাই, ছোটকাকুদের নিয়ে এই অ্যাডভেঞ্চার টিম। সঙ্গে আছেন সৌমিতার বাবা-মাও। সেখানেই আলাপ হল পর্বত গড়াই নামে একজনের সঙ্গে। তিনি নাকি গুটিকয়েক চিতা শিকারও করেছেন। এই অ্যাডভেঞ্চার ক্লাবের সদস্যরা কোন রহস্যে জড়িয়ে পড়ল?

গল্প

বিপদভঞ্জনের সর্পদোষ ১০ উল্লাস মল্লিক
হাট্টিমাটিমের ডিম ১৪ দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়
সতু সেনের কুঠিবাড়ি ৪৪ শিবানন্দ পাল
ভবিষ্যতের দেশে ৫০ অরবিন্দ ভট্টাচার্য

অন্যান্য পাতায়

ডাকবাক্স ৪
পাঠকের পাতা ৫
বিজ্ঞানের টুকিটাকি ৭
ওয়ার্কশপ ৮
কুইজ় ১৩
ক্যাম্পাস ২৭
আশ্চর্য পৃথিবী ৪২
কমিক হিরো ৪৩
বেড়ানো ৫৭
অমিল খোঁজো, তফাত বোঝো ৫৮
হাসছি দ্যাখো ৫৮
অর্থ শেখো, শব্দসন্ধান ৫৯
নানারঙের রামধনু ৬০

প্রচ্ছদ: সৌরভ মুখোপাধ্যায়

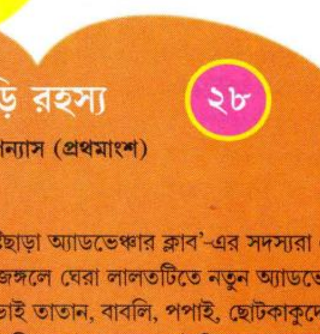

খেলাধুলো

জার্মান ফুটবলের মহাতারকা ৬১ চন্দন রুদ্র
এবার যাঁদের শেষ বিশ্বকাপ ৬২ সুমন বন্দ্যোপাধ্যায়
রোনাল্ডোর ১৪টি গোল্ডেন গোল ৬৪ অর্ঘ্য মুখোপাধ্যায়
ফ্রিস্টাইল ৬৬ চন্দন রুদ্র

সম্পাদক: **পৌলোমী সেনগুপ্ত সরকার**

এবিপি প্রাঃ লিমিটেডের পক্ষে বিজিৎ কুমার বসু কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত এবং ৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১ থেকে মুদ্রিত। বিমান মাশুল: ত্রিপুরা, আন্দামান, মণিপুর এক টাকা। পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার অনুমোদিত।

চোরের নাম হ্যারি পট্টর

এপ্রিল সংখ্যায় 'আনন্দমেলা'য় 'ই থিপ ডট কম' গল্পটি নিয়ে আমার একটি অভিযোগ আছে। এই গল্পে চোরের আধুনিক নাম দেওয়া হয়েছে 'হ্যারি পটার'। চোরের নাম কেন জে কে রাউলিয়ংয়ের লেখা জনপ্রিয় চরিত্র হ্যারি পটার-এর নামে রাখা হবে? আশা করি, আপনারা এর উত্তর দেবেন।

প্রার্থনা দাস

(ই-মেলের মাধ্যমে)

অষ্টম শ্রেণি, সেন্ট জন্স ডায়োসেশন গার্লস এইচ এস স্কুল

সম্পাদকীয় উত্তর: গল্পে ছাপা হয়েছে 'হ্যারি পট্টর'। হরি পান্তরটাকে ইংরেজি ঘেঁষা করার জন্য 'হ্যারি পট্টর'লেখা হয়েছে। কোথাও হ্যারি পটার লেখা হয়নি। তোমার পড়ার ভুলেই এই বিভ্রান্তি।

রহস্য উপন্যাসে ভুল

মে সংখ্যা 'আনন্দমেলা'য় 'ভেনিসে পিন্টুমামা' উপন্যাসে একটি ভুল চোখে পড়ল। ৫৮ পাতায় যে ধাঁধাটি দেওয়া হয়েছে, সেখানে 'রামের শরণ' কথাটি কোথাও নেই, অথচ ৬১ পাতায় 'রামের শরণ' কথাটির উল্লেখ রয়েছে।

সৌরভ চন্দ্র

বারুইপুর, কলকাতা ৭০০ ১৪৪

(ই-মেলের মাধ্যমে)

লেখিকার উত্তর: লেখাটি কপি করার সময় ভুলবশত দু'টি লাইন বাদ পড়ে গিয়েছে। 'পাতালঘরে ঘরবন্দি/বনের রাজা বাঘবন্দি'। এর পরই যে দু'টি লাইন হবে তা হল, 'মরণ যদি আসে ধেয়ে/বাঁচবে রামের শরণ নিয়ে'। আমার ভুল ধরিয়ে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ।

রামধনুর রং উলটো

এপ্রিল সংখ্যা 'আনন্দমেলা'য় 'নানা রঙের রামধনু'তে রংগুলো উলটো ছাপা হয়েছে। সবচেয়ে নীচের রং হবে বেগুনি আর সবচয়ে উপরের রং হবে লাল। এ ছাড়া সব বিভাগ ভাল লেগেছে।

বিশঙ্ক সরকার

প্রথম শ্রেণি, মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম বুনিয়াদি বিদ্যালয়
রিষড়া, হুগলি

সম্পাদকীয় উত্তর: তুমি রামধনুর রঙের যে বর্ণনা দিয়েছ, তা ঠিক। কিন্তু 'নানারঙের রামধনু' বিভাগটিতে রঙের ব্যবহারে অনেকটাই কল্পনার স্বাধীনতা নেওয়া হয়েছে। বৈজ্ঞানিক যুক্তির চেয়ে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে কল্পনাকেই ।

মাসে দু'বার আনন্দমেলা

আমি নিয়মিত 'আনন্দেমালা' পড়ি। মে মাসের আনন্দমেলায় 'ভেনিসে পিন্টুমামা', 'গল্পবলিয়ে ভুলুমামা' ভাল লাগেনি। 'ঘুরঘুটিয়ার ঘটনা', 'সত্যি হিরো', 'হারানো হিরের আংটি' পড়ে দারুণ লেগেছে। এই ধরনের গোয়েন্দা গল্প সংখ্যা আরও চাই। আনন্দমেলায় রঙিন পোস্টার চাপা হলে ভাল হয়। মাসে দু'বার আনন্দমেলা বেরোলে দারুণ হয়।

রানা দাস

দশম শ্রেণি, সাঁতা হাই স্কুল, বার্নপুর

স্পাইডারম্যান ও হ্যারি পটারের কমিক্স

মে সংখ্যায় সত্যজিৎ রায়ের 'ঘুরঘুটিয়ার ঘটনা' পড়ে ভাল লাগল। সেই সঙ্গে আমার অনুরোধ, স্পাইডারম্যান, হ্যারি পটার নিয়েও কমিক্স ছাপা হোক।

পৃথ্বীদীপ গোস্বামী

ষষ্ঠ শ্রেণি, কানাইলাল বিদ্যামন্দির, চন্দননগর

'হিজিবিজি'কে নিয়ে লেখা

অগস্ট ২০০৫-এর মতো এবারও যদি 'হিজিবিজি'কে নিয়ে 'আনন্দমেলা'য় লেখা ছাপা হয় তা হলে খুব ভাল লাগবে। মে সংখ্যা আনন্দমেলা পড়ে ভাল লাগল। 'বিজ্ঞানের টুকিটাকি' বিভাগটি এক পাতার বদলে দু' পাতা করলে ভাল হয়।

আফ্রিদি শাহরিয়র

ষষ্ঠ শ্রেণি, বহরমপুর জে এন আকাদেমি

পত্রিকা ভাল লাগলে জানাও, খারাপ লাগলেও। ডাকে তো বটেই, এখন চিঠি পাঠাতে পার 'ই-মেল'-এও।
ঠিকানা:
anandamela@ abpmail.com
লেখকের স্কুলের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন।

চাই আরও ভূতের গল্প

'আনন্দমেলা'য় 'রাপ্পা রায়ের কাণ্ড' পড়ে ভাল লাগল। মার্চ সংখ্যার ভূতের গল্পগুলোও অনবদ্য। প্রতি সংখ্যায় অন্তত দু'টো করে ভূতের গল্প ছাপা হোক। 'অমিল খোঁজো তফাত বোঝো', 'অর্থ শেখো', 'হাসছি দ্যাখো', 'শব্দসন্ধান' বিভাগগুলো আমার খুবই প্রিয়।

স্বর্ণালি ভট্টাচার্য

ষষ্ঠ শ্রেণি, বেলঘরিয়া মহাকালী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়

রূপকথাও থাকুক

'আনন্দমেলা'য় ডিটেকটিভ, অ্যাডভেঞ্চার ও রহস্য নিয়ে নানা গল্প, উপন্যাস থাকে, কিন্তু রূপকথার গল্প খুব কমই থাকে। আমি রূপকথার গল্প আনন্দমেলার পাতায় দেখতে চাই।

অভিজিৎ চন্দ

সপ্তম শ্রেণি, উত্তরপাড়া চিলড্রেনস ওন হোম

'বর্ষার ছবি' প্রতিযোগিতার ফলাফল।

দেবস্মিতা সাহা *অষ্টম শ্রেণি*
তারাসুন্দরী বালিকা বিদ্যাভবন, হাওড়া

১

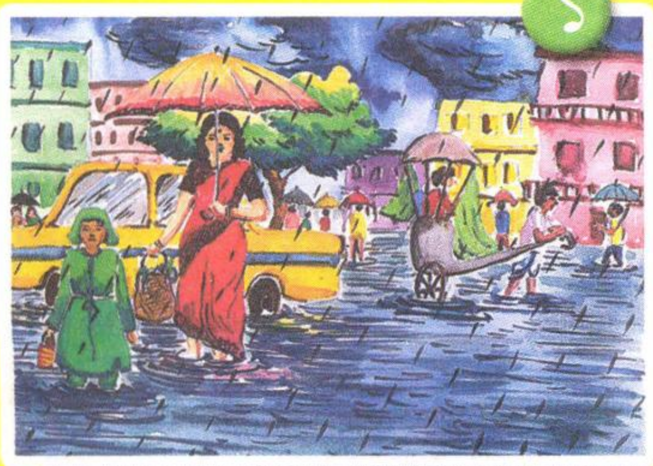

সম্বিত হালদার *সপ্তম শ্রেণি*
রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম উচ্চ বিদ্যালয়, রহড়া

২

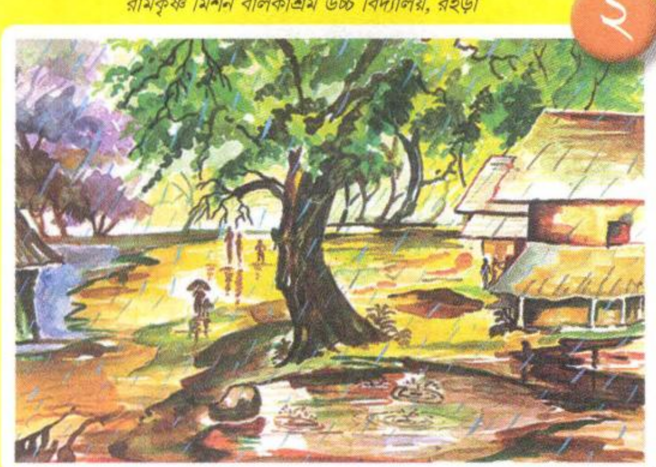

অর্চিতা দাস *অষ্টম শ্রেণি*
রহড়া ভাবনাথ ইনস্টিটিউশন ফর গার্লস, কলকাতা

৩

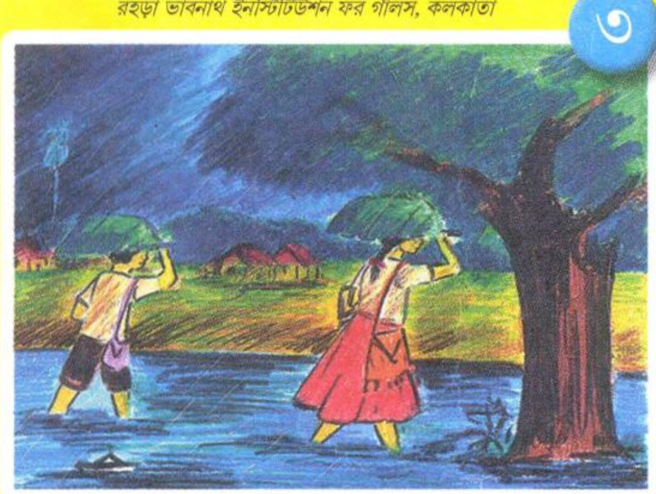

পাঠকের পাতা

এবারের প্রতিযোগিতা

বাবা যেদিন চশমা হারালেন, সেদিনের অভিজ্ঞতা লিখে পাঠাও গদ্যে ১০ লাইনের মধ্যে। ক্লাস ফোর থেকে এইটে যারা পড়ো, তারাই শুধু লেখাটি পাঠাবে ২০ জুলাই তারিখের মধ্যে। স্কুলের প্রধানকে দিয়ে লেখাটি প্রত্যয়িত করিয়ে দিও। সেরা কয়েকটা লেখা আমরা অগস্ট সংখ্যায় ছাপব। বাড়ির ঠিকানা, পিনকোড, ফোন নম্বর, স্কুলের নাম আর ক্লাস জানিও বাংলা আর ইংরেজিতে।

ঠিকানা: **পাঠকের পাতা**
আনন্দমেলা
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০১

এ ছাড়া আরও যাদের ছবি ভাল হয়েছে

মৌমিতা চৌধুরী, *অষ্টম শ্রেণি, যাদবপুর বিদ্যাপীঠ, কলকাতা*

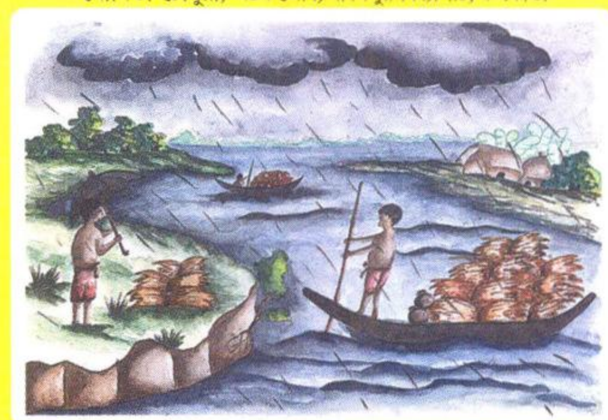

রনিত বাড়, *ষষ্ঠ শ্রেণি, হরিপাল গুরুদয়াল উচ্চ বিদ্যালয়, হুগলি*

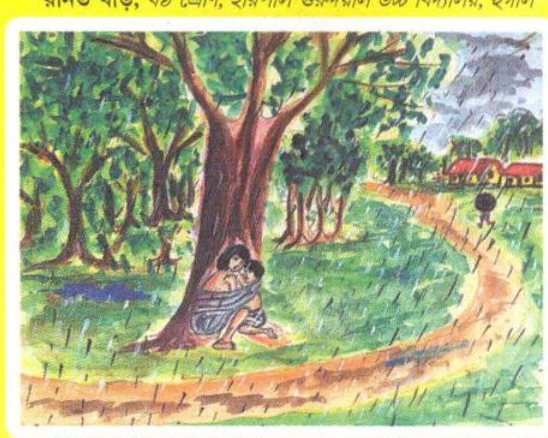

আনন্দ কমিক্‌স

প্রিয়জনকে আনন্দ উপহার
গিফ্‌ট কুপন

১২৫ টাকা, ২৫০ টাকা, ৫০০ টাকা ও ১০০০ টাকা মূল্যের এই কুপনের বিনিময়ে পাবেন পছন্দের বই। কুপন কেনার তারিখ থেকে এক বছরের মধ্যে বই সংগ্রহ করতে হবে। গিফট কুপন পাওয়া যাবে ৬৭এ, মহাত্মা গাঁধী রোড, কলকাতা-৭০০০৯ এবং ১৯০/২ রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা ৭০০০২৯-এ অবস্থিত আমাদের বিপণন কেন্দ্র থেকে।

টেনিদার কমিক্‌স
কাহিনী: নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
ছবি: অরিজিৎ দত্ত চৌধুরী

ঝাউ-বাংলোর রহস্য ৬০.০০
টেনিদা আর সিন্ধুঘোটক-ইয়েতি ৭৫.০০

ময়ূখ চৌধুরী

অ্যাডভেঞ্চার কমিক্‌স ৪০.০০

সন্তু-কাকাবাবুর অ্যাডভেঞ্চার কমিক্‌স
কাহিনী: সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
চিত্রনাট্য ও ছবি: বিজন কর্মকার

ভয়ংকর সুন্দর ৬০.০০

নীল ও জগাদার অ্যাডভেঞ্চার
কাহিনী ও ছবি: কৌশিক কুণ্ডু

গোখরো দ্বীপের ডাকিনী ৬০.০০

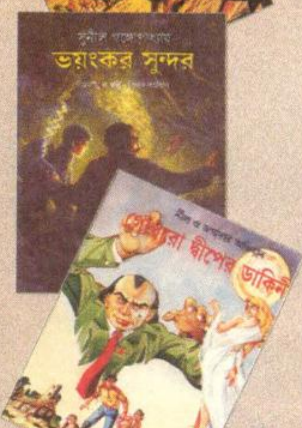

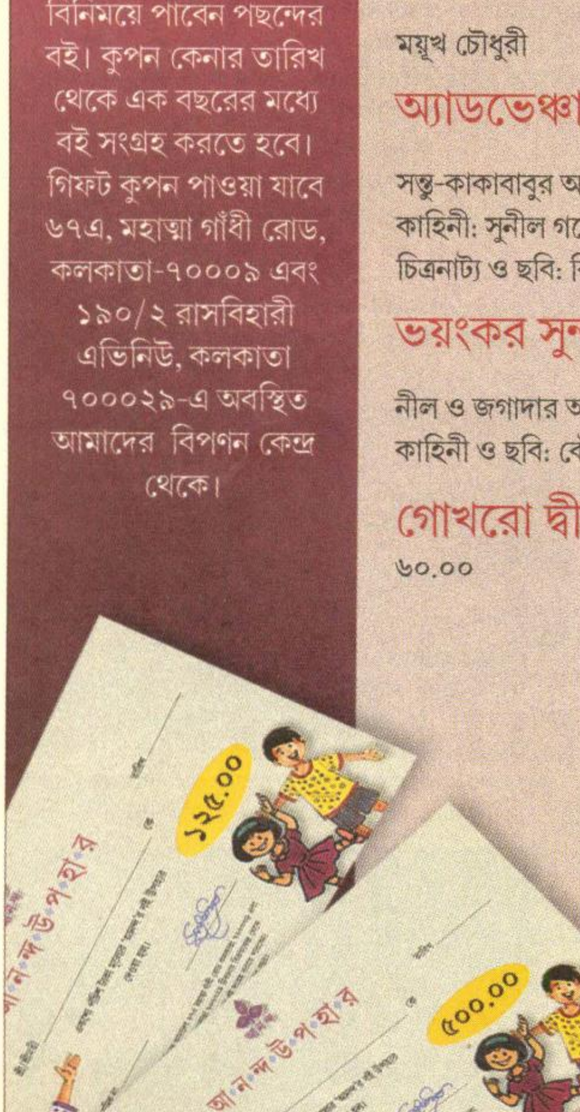

দক্ষিণ কলকাতায় আনন্দ-র বই

গড়িয়াহাটে রাসবিহারী এভিনিউ-র ওপরে যতীন বাগচী রোড এবং হিন্দুস্থান পার্কের মধ্যবর্তী অঞ্চলে
১৯০/২ রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা ৭০০ ০২৯। ফোন: ২৪৬৪ ৬২১২
ঠিকানায় পাবেন আনন্দ-প্রকাশিত সমস্ত বই। নিজের হাতে দেখে পছন্দ করে বই কেনার সুযোগ।
রবিবারেও খোলা থাকছে।

বইপাড়ায় আমাদের দোকান

নিজের হাতে দেখে, বাছাই করে পছন্দের বই কেনার সুযোগ।
৬৭এ, মহাত্মা গাঁধী রোড,কলকাতা ৭০০ ০০৯
নব 'আনন্দ'-এ সবার নিমন্ত্রণ
ক্রেডিট কার্ডের সুবিধা পাওয়া যাবে

আনন্দ

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯
ফোন: ২২৪১ ৪৩৫২, ২২৪১ ৩৪১৭। ফ্যাক্স: ২২১৯ ৩৮৫৬। ই-মেল: ananda@cal3.vsnl.net.in ওয়েবসাইট : www.anandapub.com

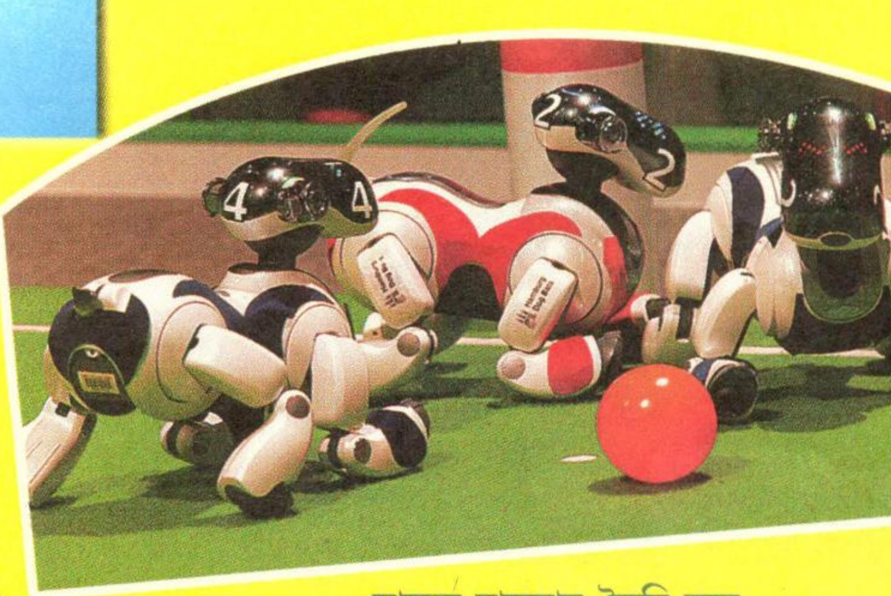

হিউম্যানয়েডরা খেলছে রোবো-কাপ ফুটবল

রোবটরা আর পিছিয়ে নেই! মানুষ ফুটবলাররা ওয়ার্ল্ড কাপ ফুটবল খেলছেন, রোবটরাই বা বাদ থাকবে কেন? তারাও এখন মন দিয়ে ফুটবল খেলতে শুরু করে দিয়েছে। আর যে-সে খেলা নয়, রোবো-কাপ। তবে এই রোবটরা দু' পাওয়ালা নয়, এদের পায়ের সংখ্যা চার। জার্মানির 'ব্যরম্যান'-এ রোবো-কাপ-এ খেলছে ৩৬টি দেশের অসংখ্য রোবট। ডান দিকের ছবিতে দেখা যাচ্ছে, রোবো-কাপে বল নিজের দখলে আনার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চালাচ্ছে রোবো-ফুটবলাররা।

জয় সেনগুপ্ত

কী ভাবছেন স্টিফেন হকিং

গ্লোবাল ওয়ার্মিং, নিউক্লিয়ার যুদ্ধ বা জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে তৈরি ভাইরাসে খুব দ্রুতই ধ্বংস হয়ে যাবে এই পৃথিবী। মুছে যাবে মানবজাতির অস্তিত্ব। আর শেষের সেই ভয়ংকর দিনগুলোর কথা মাথায় রেখে আমাদের এখনই বেরিয়ে পড়া উচিত এই গ্রহ ছেড়ে। ছড়িয়ে পড়া উচিত মহাকাশে, আস্তানার সন্ধানে। কথাগুলো কোনও জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্বাণী নয়। এ-কথা বলেছেন চৌষট্টি বছর বয়স্ক পদার্থবিদ স্টিফেন হকিং (সঙ্গের ছবি)। হংকং সফররত হকিং সম্প্রতি একটি সাংবাদিক সম্মেলনে এরকম মন্তব্য করে রীতিমতো শোরগোল ফেলে দিয়েছেন। আগামী কুড়ি বছরের মধ্যে চাঁদে মানুষ স্থায়ী 'বেস' তৈরি করে ফেলবে, আর মঙ্গলে কলোনি গড়তে মানুষের সময় লাগবে বড়জোর চল্লিশ বছর, এমনই ধারণা ওই বিজ্ঞানীর। তবে এই মুহূর্তে দ্বিতীয় ঠিকানা হিসেবে চাঁদই প্রথম পছন্দ এই খ্যাতনামা পদার্থবিদের। তাঁর এই ধরনের মন্তব্য নিয়ে বিতর্ক উঠেছে বিজ্ঞানী-মহলে। অধিকাংশের মতে হকিংয়ের আশঙ্কা অমূলক এবং মহাকাশে অন্য গ্রহে-উপগ্রহে বসতি স্থাপন করতে বাস্তবে সময় লাগবে আরও বেশি।

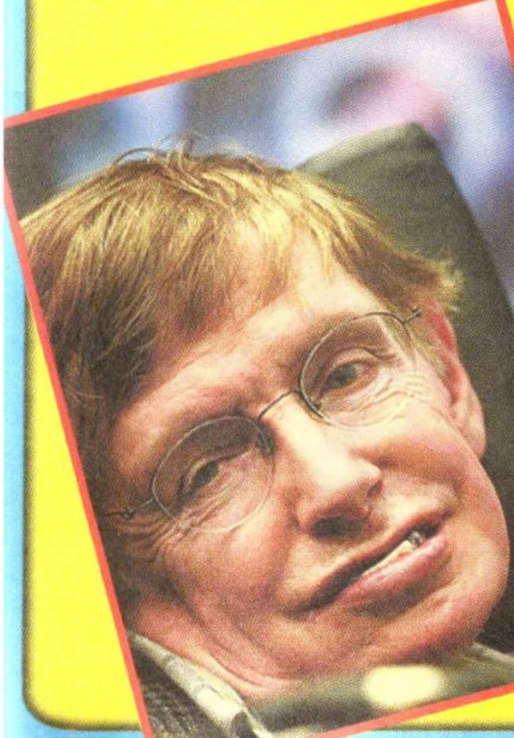

মাছের চামড়ায় তৈরি হবে জুতো, ব্যাগ

মাছের তেলে মাছভাজার পাশাপাশি যদি মাছের চামড়া দিয়ে তৈরি করা যায় জুতো, ব্যাগ ইত্যাদি, তবে কেমন হয়? সম্প্রতি এরকম কাজ করে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন দুই বঙ্গতনয় সন্দীপ দাম ও ঋষিণ দে। গভর্নমেন্ট কলেজ অব ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড লেদার টেকনোলজির ফাইনাল ইয়ারের এই দুই ছাত্র আবিষ্কার করেছেন মাছের দেহত্বক থেকে উন্নতমানের লেদার তৈরির কৌশল। চর্মশিল্পে প্রচলিত ট্যানিং প্রক্রিয়াটিকেও সম্পূর্ণ পালটে দিয়ে ক্ষতিকর রাসায়নিকের ব্যবহার বর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন তাঁরা। বোয়াল, ভেটকি, তেলাপিয়া—এই সব মাছ থেকে উৎকৃষ্ট মানের চামড়া পাওয়া যাবে বলে জানিয়েছেন এই দুই ছাত্র। তবে চর্মোৎপাদন প্রক্রিয়ার পেটেন্ট না পাওয়া পর্যন্ত তাঁদের আবিষ্কারের টেকনিক্যাল খুঁটিনাটি নিয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছেন তাঁরা।

কলা থেকে কারেন্সি নোট

সব কলা নয়, তন্তুময় বিশেষ ধরনের কলা 'অ্যাবাকা' (বৈজ্ঞানিক নাম 'মুসা টেক্সটাইলিস') থেকে জাপানে তৈরি হচ্ছে সেদেশের কারেন্সি নোট 'ইয়েন'। অ্যাবাকার কলা-তন্তুতে পাট বা মেস্তার মতো তন্তুফসলের চেয়েও বেশি পরিমাণে সেলুলোজের উপস্থিতি লক্ষ করেছেন বিজ্ঞানীরা, যা কিনা তন্তুর গুণগত উৎকর্ষের পরিচায়ক। শুধুমাত্র কারেন্সি নোট নয়, বিভিন্ন কুটিরশিল্প এবং টেক্সটাইল শিল্পেও দিব্যি কাজে লাগছে কলার তন্তু।

সুমন চট্টোপাধ্যায়

ছ'টা দিনই ছিল জমজমাট। অভিভাবকদের হাত ধরে আসা ছোট ছেলেমেয়েরা যেন সেদিন হয়ে উঠেছিল একঝাঁক রঙিন প্রজাপতি। কীরকম হয়েছিল এ-ক'দিনের ওয়ার্কশপ?

আনন্দমেলা

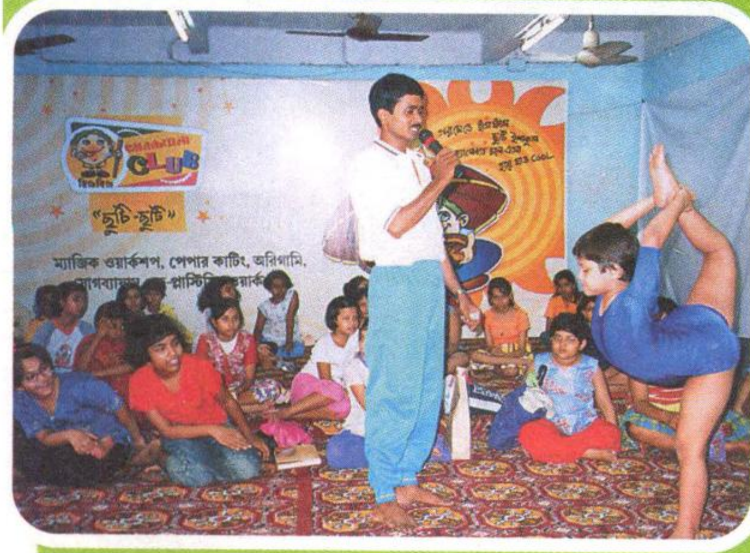

বছরে মাত্র একবার কেন গ্রীষ্মকাল আসে? ছোট ছেলেমেয়েরা এতে খুশি নয় একেবারেই। শুনে আশ্চর্য মনে হচ্ছে? গরমে আমরা যখন হাঁসফাঁস করছি, দেশপ্রিয় পার্কের ন্যাশনাল হাই স্কুল ফর গার্লস-এ আনন্দমেলা ক্লাবের সামার ক্যাম্পে তখন এরকম অদ্ভুত কথাই শোনা গিয়েছিল ছোটদের মুখ থেকে! কারণ, যতবার গ্রীষ্মকাল আসবে, ততবারই সামার ক্যাম্পে আসতে পারবে যে তারা!

সেদিন কী হয়েছিল আনন্দমেলার সামার ক্যাম্পে? উত্তরে প্রশ্ন উঠতে পারে, কী হয়নি! সারা বছর পড়াশোনার চাপ, অভিভাবকদের শাসন, সব কিছুকে অনায়াসে দূরে সরিয়ে দিয়ে খুশি আর আনন্দের জোয়ারে নিজেদের ভাসিয়ে দিয়েছিল ছেলেমেয়েরা। 'গরমেতে হাঁসফাস, ছুটি ইশকুল/ক্যাম্পেতে চলে এসো, হয়ে যাও কুল'—এই ছিল সেদিনের সামার ক্যাম্পের থিম। সামার ক্যাম্পের ওয়ার্কশপ শুরু হয়েছিল মে মাসের ১৯ তারিখে।

ক্যাম্পের প্রথম দিনের ওয়ার্কশপ জমে উঠেছিল পেপার ক্রাফ্‌ট দিয়ে। এর জন্য যাবতীয় দরকারি জিনিস আনন্দমেলা ক্লাবের তরফ থেকেই দেওয়া হয়েছিল ছেলেমেয়েদের। ওয়ার্কশপ পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন হিন্দু স্কুলের শিক্ষক মদনগোপাল দত্ত। ক্লাব মেম্বারদের তিনি শিখিয়ে দিলেন কীভাবে তৈরি করতে হয় 'মডিউলার গ্লোব'। জানা গেল পরের দিনের অনুষ্ঠানও ছিল এই পেপার ক্রাফ্‌ট নিয়েই।

শুধু ভাঁজ করে কীভাবে তৈরি করা যায় মনের মতো জিনিস! ছুরি-কাঁচির দরকার নেই, নেই কাগজ কাটাছেঁড়ার প্রশ্ন! দু' হাতের আঙুলের খেলায় ভাঁজের পর-ভাঁজ দিয়ে যে তৈরি করা যায় গোরু, কুকুর, উড়ন্ত পাখি, তা কি ছোটদের এত ভালভাবে জানা ছিল আগে? এর নাম ওরিগামি। এই জাপানি শিল্পকর্মটি নিয়ে ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হল ২০ তারিখে। ১০ টাকার নোটের সাইজের কাগজ দিয়ে কীভাবে অবলীলায় তৈরি করে ফেলা যায় নানারকম জিনিস, ক্লাব মেম্বাররা শিখে গেল তা। সঙ্গের অভিভাবকরাও খুশি। কারণ, তাঁদের প্রিয়জন রপ্ত করে ফেলেছে এক টুকরো কাগজ দিয়ে ওরিগামির সৃজনশীল কলাকৌশল।

স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়া উচিত ছেলেবেলা থেকেই, আর তার জন্য দরকার খেলাধুলো। ছোটদের সেই সুযোগের অভাব তো রয়েছেই, সেই সঙ্গে রয়েছে ভারী স্কুলব্যাগ কাঁধে নিয়ে যাওয়া। আর-একটা সমস্যা বেশিরভাগ ছেলেমেয়েই জানে না, তা হল সঠিকভাবে বসার ভঙ্গি। এসব কারণে হতে পারে পিঠে ব্যথা, হজমের গন্ডগোল, দৃষ্টিশক্তির সমস্যা, মাথা ব্যথা, মনঃসংযোগের অভাব, অবসাদ ইত্যাদির মতো অসুখ। এগুলো এড়িয়ে থাকার একমাত্র উপায় নিয়মিত যোগাসন করা। ২৬ মে-র ওয়ার্কশপের বিষয়বস্তু ছিল এটাই। আনন্দমেলার খুদে মেম্বারদের যোগব্যায়ামের ইতিহাস

হ্যারি পটার যে স্কুলে ম্যাজিক শেখে, সেই 'হগসওয়ার্থ'-এ যেতে পারেনি আনন্দমেলা ক্লাবের

ক্লাবের মজাদার সামার ক্যাম্প

যেসব মেম্বার, তাদের চিরদিন মনে থাকবে ২৭ মে তারিখটা। কারণ, ওই দিনটা ছিল শুধুই ম্যাজিকের। আনন্দমেলা ক্লাবের সামার ক্যাম্পের ওয়ার্কশপের আকাশে-বাতাসে সেদিন ম্যাজিক আর ম্যাজিক। ম্যাজিশিয়ান দিব্য ছোটদের নিয়ে গেলেন ম্যাজিকের এক আশ্চর্য জগতে। ম্যাজিকের যেসব আশ্চর্য কৌশল শিখল ছোটরা, বাড়ি ফিরে গিয়ে সকলকে তাক লাগিয়ে দেওয়ার পক্ষে তা যথেষ্ট। বেশ কিছু জটিল ম্যাজিক দেখিয়ে ম্যাজিশিয়ান দিব্য শেষ করলেন সেদিনের ওয়ার্কশপ। বাড়িতে ম্যাজিকচর্চার জন্য ছোটদের দেওয়া হল সুন্দর একটি 'ম্যাজিক কিট'।

পরের দু'টি ওয়ার্কশপ অর্থাৎ ২ আর ৩ জুন ক্লাব-মেম্বারদের শেখানো হল প্লাস্টিসাইন দিয়ে কীভাবে তৈরি করতে হয় বিভিন্ন জিনিস। টেরাকোটা শিল্পী ভাস্কর রামকুমার মান্না ছেলেমেয়েদের শিখিয়ে দিলেন মাটি দিয়ে মূর্তি তৈরির রহস্য। কেউ তৈরি করল গণেশের মূর্তি, কেউ বা

রোনাল্ডিনহো। বাদ গেল না হিজিবিজি এবং তিড়িংও। ছ'দিনের এই ওয়ার্কশপ পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন কৌশিক চট্টোপাধ্যায়।

জানালেন যোগব্যায়াম বিশারদ অমলেন্দু মণ্ডল। তাঁর কাছ থেকে যোগাসনের উপকারিতা কী, তা জেনে নিল সকলে। আমাদের দেশের ও বিদেশের কয়েকজন নামী মানুষের কথা জানা গেল তাঁর কাছ থেকে, যাঁরা যোগাসন করে ভীষণ উপকার পেয়েছেন। আনন্দমেলা ক্লাবের মেম্বারদের তিনি শিখিয়ে দিলেন বেশ কিছু যোগাসন। যারা কোনওদিন যোগাসন করেনি, তারা বাড়িতে নিজে-নিজেই করতে পারবে সহজ এই আসনগুলো। শুধু ছোটরা কেন, তাদের অভিভাবকরাও স্বচ্ছন্দে চর্চা করতে পারেন এই সব আসন। এর পর অমলেন্দুবাবু শিখিয়ে দিলেন বেশ কিছু জটিল আসনও। হাততালির মধ্য দিয়ে শেষ হল অনুষ্ঠান।

এবার মন খারাপ হয়ে গেল ছোটদের। কারণ, সামার ক্যাম্প শেষ হয়ে গেল যে! আবার কবে বসবে আনন্দমেলা ক্লাবের এরকম মজাদার ওয়ার্কশপ? একই প্রশ্ন সকলের। আর এখন থেকেই পরবর্তী অনুষ্ঠানের জন্য অপেক্ষায়ও থাকতে রাজি তারা।

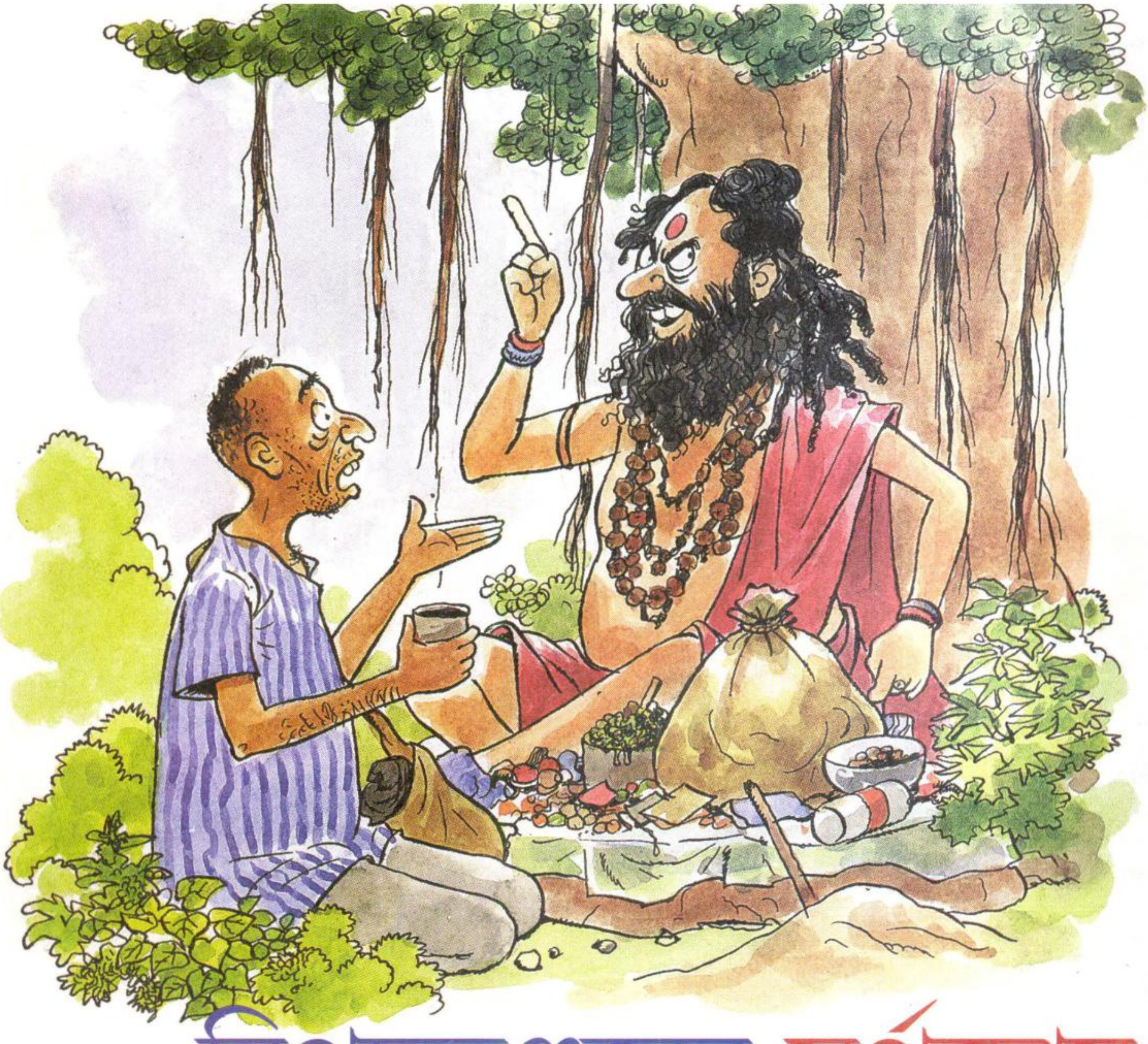

বিপদভঞ্জনের সর্পদোষ

উল্লাস মল্লিক

বিপদভঞ্জন ঠাকুরের সামনে ডান হাতখানা বাড়িয়ে ভ্যাবলা মুখে বসে আছে হাঁকু। চোখের কোণে কালি, শরীরটা শুকিয়ে আমসি। বেশ কিছুদিন হল তার বেজায় টাইট অবস্থা। দিনদিন বড় সেয়ানা হয়ে উঠেছে পাবলিক। চারপাশে পাকা বাড়ি, জানলায় লোহার গ্রিল, দরজায় মুম্বই সাইজের তালা। হাঁকু তো বাচ্চা ছেলে, তার বাপ, ঠাকুরদার ঠাকুরদা অবধি ফেল মারত। তার উপর কোনও বাড়িতে কুকুর, কোনও বাড়িতে রাতজাগা পড়ুয়া, কোথাও আবার অনিদ্রা রুগি। সারারাত ঘনঘন ঘড়ি দেখছে, জল খাচ্ছে আর বাথরুমে যাচ্ছে। এসব ম্যানেজ করে কোনও প্রকারে চালাচ্ছিল হাঁকু। কিন্তু তার কারবারে লালবাতি জ্বালিয়ে দিলেন রতনদারোগা। টোকাপুর থানায় নতুন এসেছেন রতন। খুব নিরীহ ভাল মানুষের মতো চেহারা। তাগড়াই গোঁফ নেই, ফুটবল সাইজের ভুঁড়ি নেই, চোখের দৃষ্টিটাও বেশ নরম-নরম। ফিরিওলার মতো অমায়িক ভাবভঙ্গি। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই এলাকার ত্রাস হয়ে উঠেছেন রতনদারোগা। চোর-বদমাশ ধরা পড়লে তিনি মারধোরের হাঙ্গামায় বিশেষ যান না, কিন্তু তার বদলে যা করেন তা আরও

ভয়ংকর। এই তো কিছুদিন আগে একবার ধরা পড়েছিল হাঁকু। রতনদারোগা প্রথমে তাকে পঞ্চাশ গ্রাম মুড়ির সঙ্গে একশো গ্রাম কাঁচালঙ্কা খাওয়ালেন, তারপর গরম চা। ওহ, বাপ রে বাপ! মনে পড়লে এখনও গায়ে কুলকুল করে ঘাম দেয় হাঁকুর।

এর মধ্যে আশার আলো বলতে এই বিপদভঞ্জন ঠাকুর। কয়েক দিন আগে টোকাপুরে এসেছেন। আস্তানা গেড়েছেন গ্রামের শেষ প্রান্তে করালকালী শ্মশানে। শোনা যাচ্ছে, উনি নাকি ত্রিকালসিদ্ধ পুরুষ। হিমালয়ের উপর পাঁচশো বছর আর গঙ্গার নীচে হাজার বছর একমনে তপস্যা করেছেন। সিদ্ধিলাভের পর সব পাজি গ্রহ-নক্ষত্রকে বশ করে ফেলেছেন উনি। এখন মানুষের হস্তরেখা বিচার করে তাগা-মাদুলি-আংটি ইত্যাদি দেন। অব্যর্থ সব বিচার আর মোক্ষম সব দাওয়াই, কাজ না হয়ে যায় না। দোগেছের রামরতন ঘোষালের মেয়ের বিয়ে হচ্ছিল না। আংটি ধারণ করে সৎ-পাত্রস্থ হল, পলাশপুরের ভজহরি দুধওলার ছেলেটা কলেজ থেকে পাশটাশ করে বেকার ঘুরে বেড়াচ্ছিল বহুদিন। মাদুলি ধারণ করে এখন এক দুধ তৈরির কোম্পানিতে খুব উঁচু পদে বহাল হয়েছে।

এই সব শুনে অনেক আশা নিয়ে হাঁকু এসেছে বিপদভঞ্জন ঠাকুরের কাছে। করালকালী শ্মশান দিনের বেলাতেও বেশ ছমছমে জায়গা। ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া বট-অশ্বত্থ-পাকুড় গাছে চারপাশ বেশ অন্ধকার মতো। মোটা-মোটা ঝুরি নেমেছে চারপাশে। শ্মশানের পিছন দিকে তিরতিরে সরু নদী, নদীর ওপারে ধু-ধু মাঠ। মোটা একটা বটগাছের নীচে ঠাকুরের ঝুপড়ি। ঝুপড়ির সামনে একটা কম্বলের আসনের উপর বসে আছেন ঠাকুর। ঠাকুরকে দেখলেই ভক্তিতে পেন্নাম ঠুকতে ইচ্ছে করে। রক্তাম্বর জটাজুট, গোঁফ-দাড়ি, তার সঙ্গে কপালে লাল তিলক আর গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। দেখলেই ভিতরটা গুড়গুড় করে ওঠে। লাল গনগনে চোখ আর বুক হিম করে দেওয়া আগুনে দৃষ্টি। হাঁকু মনে-মনে বেশ খুশি। হ্যাঁ, ঠিক লোকের কাছেই এসেছে সে। ইনিই পারবেন এক মন্তরে রতনদারোগাকে কায়দা করে দিতে।

হাঁকুর হাতখানা নিয়ে অনেকক্ষণ উলটেপালটে টিপে-টিপে দেখছেন বিপদভঞ্জন। চোখ দু'টো কখনও বড়, কখনও ছোট হয়ে যাচ্ছে, মাঝে-মাঝে ভাঁজ পড়ছে কপালে। ঝোলা থেকে দু'-একবার আতশ কাচও বের করেছেন, কিন্তু মুখে কোনও কথা নেই। কয়েকবার শুধু 'হুম' 'হাম' শব্দ বেরিয়েছে মাত্র। তারপর ফের কুলুপ পড়ে গিয়েছে মুখে। ঠায় হাত বাড়িয়ে বসে থেকে হাতে ঝিনঝিনে ধরে গিয়েছে হাঁকুর। শেষে মরিয়া হয়ে বলেই ফেলল, "কী দেখলেন বাবা?"

বিপদভঞ্জন মুখটা একটু গম্ভীর করে বললেন, "হুঁ!"

"আজ্ঞে?"

"হুম।"

ভয়ের চোটে হাতের ঝিনঝিনে মাথায় উঠে এসেছে হাঁকুর। গলা শুকিয়ে কাঠ। কোনও রকমে মিউমিউ করে জিজ্ঞেস করল, "আজ্ঞে, হাতে খারাপ কিছু দেখছেন?"

হাঁকুর হাতটা ছেড়ে দিয়ে কিছুক্ষণ চোখ বুজে বসে থাকলেন বিপদভঞ্জন। তারপর বললেন, "হুম, গুরুচণ্ডালী দোষ।"

হাঁকুর বুকের ভিতরটা গুড়গুড় করে ওঠে। মাথাটা বাঁইবাঁই করে চক্কর দিচ্ছে। ঢোক গিলে সে বলল, "সেটা কী জিনিস বাবা?"

"পার্বতীপুরের মহিম চাটুজ্জের হয়েছিল, তখন তার একেবারে নাজেহাল দশা। গোরুর বাঁটে দুধ নেই, খেতের মুনিশগুলো ফাঁকি মারছে আর তেজারতি কারবারে ভয়ংকর মন্দা। স্রেফ তিন রতির একটা রক্তমুখী নীলা দিলাম। ব্যস! এখন গিয়ে দেখে আয় একবার অবস্থাটা।"

আতশ কাচটা বের করে ফের একবার হাঁকুর হাতটা ঘুরিয়েফিরিয়ে দেখলেন বিপদভঞ্জন। মুখটা আর-একটু গম্ভীর করে বললেন, "হুম, ভৌমদোষও রয়েছে দেখছি।"

এবার হাঁকুর মাথাটা ভোঁ-ভোঁ করতে থাকে। দরদর করে ঘাম দেয় শরীরে।

বিপদভঞ্জন বলে চললেন, "লাহাবাড়ির চিনুর হয়েছিল। বাগানের সব গাছপালা শুকিয়ে কাঠ। চিনুর তো পাগল-পাগল দশা। দিলুম একটা মন্ত্রপড়া মাদুলি। ঠিক সাত দিনের মাথায় দোষ কেটে গেল। গাছভর্তি তাল, নারকোল কখন কার মাথায় পড়ে এই ভয়ে এখন কেউ আর চিনুর বাগানের পাশ দিয়ে হাঁটে না।"

হাঁকু মিউমিউ করে বলল, "তা ঠাকুর, আমাকে কিছু একটা দিন, দোষগুলো চুকেবুকে যাক।"

"সে তো দেবই, এই জন্যই তো আমার আবির্ভাব রে ব্যাটা। কিন্তু মায়ের পুজো এনেছিস তো?"

"আজ্ঞে!"

"মায়ের পুজো রে ব্যাটা, মায়ের পুজো। মায়ের পুজো ছাড়া এসব শুভ কাজ হয়! দে একশো এক টাকা, মায়ের ভোগ চড়াব।"

"একশো এক টাকা!" হাঁকুর চোখ কপালে ওঠে।

বিপদভঞ্জন খেঁকিয়ে ওঠেন, "কানে কম শুনিস নাকি? কতবার বলব?"

হাঁকু এবার ভ্যাক করে কেঁদে ফেলল, "অত টাকা কোথায় পাব বাবা! বাজার বড্ড মন্দা, রতনদারোগার জ্বালায় তিষ্ঠোতে পারছি না। একটু কমসম করুন বাবা।"

"ওর কমে হয় না রে, একশো একান্ন টাকা রেট যাচ্ছে এখন। তোর মতো গরিব-গুর্বোদের কিছুটা ডিসকাউন্ট দিই।" বলে ধ্যানস্থ হলেন বিপদভঞ্জন। পাশে বসে নাকিসুরে পিনপিন করে কাঁদতে থাকে হাঁকু।

সূর্যটা পশ্চিম দিকে ঢলে পড়েছে। আরও একটু অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে শ্মশানে। কাঁদতে-কাঁদতে একটু ঝিমুনিমতো এসেছিল হাঁকুর। হঠাৎ পিছন থেকে ঠেলা খেয়ে চমকে ওঠে। চেয়ে দ্যাখে, ছকু। এ লাইনে তার গুরুদেব। কিন্তু এ কী চেহারা হয়েছে ছকুর! পাকিয়ে একেবারে দড়ি হয়ে গিয়েছে। পাঁজরের হাড়গুলো পর্যন্ত গোনা যায়। এক সময় ছকুর কাছ থেকে লাইনের অনেক খুঁটিনাটি শিখেছে হাঁকু। আশপাশের দশ-বিশটা গাঁয়ে সবাই এক ডাকে চেনে ছকুকে। যেমন তুখোড় বুদ্ধি, তেমনই মোলায়েম হাতের কাজ। সবচেয়ে বড় কথা, সে দিনক্ষণ, তিথি-সময়ের বাছবিচার করে না। সে ভর দুপুরই হোক বা চাঁদনি রাত, ছকু কাজ সেরে ফেলতে পারে। অনেক হুদো-হুদো দারোগাকে ঘোল খাইয়ে দিয়েছে। কিন্তু

এই ছকুও ঠেকে গেল রতনদারোগার কাছে। মোক্ষম একটা ফাঁদ পেতে রতনদারোগা ধরেছিলেন ছকুকে। তারপর রতনের যা নীতি, মারধোরের তো কথাই নেই। একটা দাবড়ানি পর্যন্ত দিলেন না। চেয়ারে বসিয়ে 'বাবা-বাছা' করে অনেকক্ষণ গল্প করলেন। বউ ছেলেপুলের খবর, গ্রামের চাষবাস, বাজারদর এই সব আরকি। শেষে তাকে দশটা কাঁচা তেঁতুল খাইয়ে এক কেজি মটর কড়াই ভাজা খাওয়ালেন। সেই থেকে ছকুর একেবারে বিচ্ছিরি অবস্থা, শক্ত খাবার দেখলেই অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে।

সোজা বিপদভঞ্জন ঠাকুরের পা দু'টো জড়িয়ে ধরে ছকু, "বাবা, দয়া করুন বাবা!"

"কে তুই?"

"আজ্ঞে, অধমের নাম ছকু।"

"কী চাইছিস বল?"

"আজ্ঞে, রতনদারোগার মরণ।"

চোখ দু'টো অর্ধউন্মীলিত করলেন বিপদভঞ্জন, মুখে স্মিত হাসি। বললেন, "কেমন মরণ চাই, জলে ডোবা না গাড়ি চাপা?"

ছকু বলল, "জলে কি আর ও জিনিস ডুববে ঠাকুর! ভাল সাঁতার জানেন। সেবার তাড়া খেয়ে আমি তো ফটিকগাছির বিলে ডুবে বসে ছিলুম। তো রতনদারোগা সাঁতরে আমার চুলের মুঠি ধরে তুলে আনলেন। জলে উনি ডুববেন না।"

জটা ঝাঁকিয়ে, চোখ বড়-বড় করে বিকট একটা অট্টহাস্য করলেন বিপদভঞ্জন। বললেন, "তা হলে আর আমি আছি কেন! মন্ত্রের জোরে সব হয়। এমন মন্ত্র ছাড়ব, জলে নেমে দারোগার হাত-পা এলিয়ে যাবে। দেখি, তোর হাতটা দে।"

বিপদভঞ্জনের পা দু'টো ছেড়ে তাড়াতাড়ি হাতটা বাড়িয়ে দেয় ছকু। হাতটা এক পলক দেখে বিপদভঞ্জন বললেন, "হুম।"

ছকু বলল, "হবে ঠাকুর?"

"কী?"

"রতনদারোগার মরণ।"

আতশ কাচটা ছকুর হাতের উপর ঘোরাতে-ঘোরাতে বিপদভঞ্জন বললেন, "হতে পারে, তবে তোর দোষটা আগে কাটাতে হবে।"

ছকু বলল, "অন্য কাজকাম জানি না। চুরি করে খাই, দোষঘাট তো একটু হবেই ঠাকুর।"

"দুর, সে দোষ নয়, এ হল কালসর্পদোষ, তোর হাতে দেখতে পাচ্ছি। বড় খতরনক জিনিস! যাকে ধরবে তার একেবারে সাড়ে-সর্বনাশ।"

ফের বিপদভঞ্জনের পা দু'টো জড়িয়ে ধরে ছকু বলল, "আপনি আমায় বাঁচান বাবা, কী দোষ যেন বললেন, সেই দোষ কাটিয়ে দিন।"

চোখ দু'টো বড় করে আবার অট্টহাস্য করলেন বিপদভঞ্জন। বললেন, "ভয় মত কর ব্যাটা, সব বিলকুল ঠিক হয়ে যাবে। সামনের অমাবস্যায় একটা হোম করব, খুব জাগ্রত হোম। এখন কী করে মারব বল? জলে ডুবিয়ে মারলে তিনশো এক টাকা, আর গাড়ি চাপা দিলে চারশো এক টাকা।"

হাঁকু জিজ্ঞেস করে, "আজ্ঞে, কিসের টাকা?"

"হোমের খরচ রে! জলে ডুবে মরলে তাড়াতাড়ি মরবে তাই রেট কম, আর গাড়ি চাপা পড়লে তিন মাস বিছানায় দপ্পাবে। বলিস যদি ওটা ছ'মাস করে দিতে পারি। তবে পাঁচশো এক টাকা চার্জ লেগে যাবে।"

দাঁতকপাটি খেয়ে প্রায় পড়েই যাচ্ছিল ছকু, নেহাত টোকো দাঁত বলে সামলে নিল। তারপর হাউমাউ করে বলে উঠল, "আমাকে বেচলেও অত টাকা হবে না বাবা, একটু দয়া করুন।"

বিপদভঞ্জন দাবড়ে উঠলেন, "মায়ের সেবায় দরাদরি, তুই তো মহা পাপিষ্ঠ রে। ঠিক আছে, বলছিস যখন হার্ট অ্যাটাক করে দিই। একশো একান্ন টাকা রেট, কিন্তু তিন মিনিটে ফুটে যাবে।"

হাতজোড় করে ছকু বলল, "আপনার দয়ার শরীর বাবা, রেটটা আর-একটু নামে না?"

বিপদভঞ্জন খিঁচিয়ে উঠলেন, "এ কী মাছের বাজার পেলি নাকি, একশো এক টাকা থাকে তো বের কর, না হলে কেটে পড় এখান থেকে।"

ফের ধ্যানস্থ হলেন বিপদভঞ্জন। ছকু তাড়াতাড়ি বিপদভঞ্জনের পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় ঠেকায়। তারপর হাতের ঝোলা ব্যাগ থেকে একটা কৌটো বের করে। ছোট টিনের কৌটো। বিপদভঞ্জন চোখ পিটপিট করে দেখেন।

ছকু বলল, "এই নিন বাবা, হোমের খরচ।"

বিপদভঞ্জন হাত পাতলেন। ছকু কৌটোর মুখটা খুলে তাঁর হাতে উপুড় করে দিল। একটা হিলহিলে সাপ বেরিয়ে আসে কৌটো থেকে। বিপদভঞ্জনের হাত থেকে কোলে পড়ে কিলবিল করতে থাকে সাপটা। "ও রে বাপ রে বাপ, সাপ।" বলে বিরাট একটা লাফ দিয়ে দৌড়তে থাকেন বিপদভঞ্জন। সেই সুযোগে পাশে পড়ে থাকা ছোট কাপড়ের থলেটা নিয়ে চম্পট দেয় ছকু। হাঁকু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে, তারপর সেও অনুসরণ করে ছকুকে।

শিবুময়রার দোকানে গরম জিলিপিতে একটা কামড় দিয়ে হাঁকু বলল, "জব্বর বুদ্ধি করেছ কিন্তু ছকুদা! এই জন্যই তোমাকে গুরু মানি।"

গোটা একটা জিলিপি মুখে পুরে ছকু বলল, "ব্যাটা জোচ্চোর কোথাকার, লোক ঠকাবার ধান্দা।"

হাঁকু বলল, "তুমি বুঝলে কী করে সাধুটা নকলি মাল?"

"আরে আমার চোখকে ফাঁকি দেবে এমন শম্মা জন্মাতে বাকি। ওটার জটা-দাড়ি দেখেই বুঝেছিলাম এসব ঝুটো। ক'দিন আগেও একবার এসেছিলাম, তখন কীসব রাহু-কেতু-শনি ডাউন আছে বলল। সেদিন থেকে তালে ছিলাম, আজ উঠোনে হেলে সাপটা দেখে মতলবটা মাথায় আসে।"

হাঁকু বলল, "যাই বলো, ঠাকুর জোর ভয় পেয়ে গিয়েছে। কেমন জোরে ছুটল দেখলে! ওহ, আমরা যদি অমন ছুটতে পারতাম তা হলে রতনদারোগার হাতে নাকাল হতে হত না।"

ফের একটা জিলিপি মুখে পুরে ছকু বলল, "ব্যাটা পালানোর কায়দাটা আমাদের শেখাতে পারত, কিছু দক্ষিণা দিতাম। তা নয়, বলল কিনা কালসর্পদোষ! ওর নিজের কপালে যে হেলেসর্পদোষ নাচছে, সেটা বুঝতে পারেনি। ব্যাটা চোরের হদ্দ।"

ছকুর কথা শুনে হো-হো করে হেসে উঠল হাঁকু। তারপর আঙুলে লাগা রসটুকু চাটতে-চাটতে বলল, "যা বলেছ!"

ছবি: দেবাশিস দেব

কুইজ়

সুপারম্যান চরিত্রটি ছোট-বড় সকলেরই প্রিয়। এই মাসেই মুক্তি পাচ্ছে সুপারম্যানকে নিয়ে তৈরি নতুন ছবি। এবারের কুইজ়ও সুপারম্যানকে নিয়েই।

১ জেরি সিগেল ছাড়া সুপারম্যানের স্রষ্টা হিসেবে আর কার নাম নেওয়া হয়?

২ কোন গ্রহ থেকে সুপারম্যানকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন তাঁর বাবা-মা?

৩ সুপারম্যানের আসল নাম কাল-এল। পৃথিবীতে এসে তাঁর কী নামকরণ হয়?

৪ কার্ক অ্যালিন, জর্জ রিভ্‌স, ডিন কেন, ক্রিস্টোফার রিভ, রবার্ট রেডফোর্ড—এঁদের মধ্যে কে সুপারম্যানের চরিত্রে অভিনয় করেননি?

৫ কোন বছর প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল সুপারম্যান কমিক্‌স?

৬ সুপারম্যান কোন খবরের কাগজে সাংবাদিকতা করেন?

৭ সুপারম্যানের একটি পোষা কুকুর ছিল। তার নাম কী?

৮ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কানসাস-এর কোন শহরের বাসিন্দা সুপারম্যান?

অভিজিৎ সুকুল, তনুশঙ্কর চক্রবর্তী

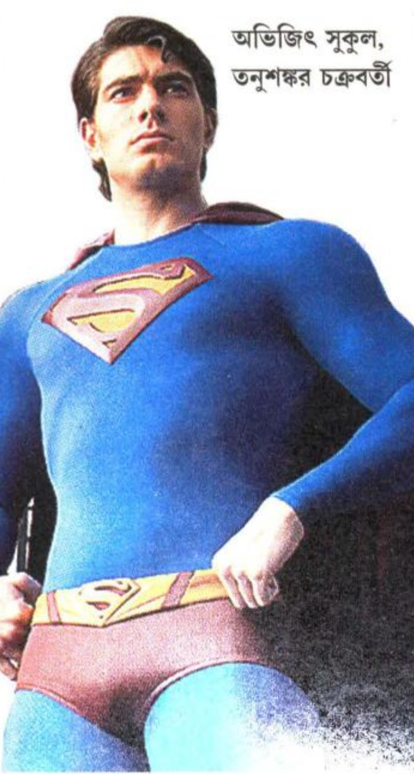

গত সংখ্যার উত্তর

১. বার্লিন স্টেডিয়ামে।
২. ফ্রান্সের লঁরা ব্লাঁ (প্যারাগুয়ের বিপক্ষে) ১৯৯৮ সালে।
৩. পিল্লি।
৪. মেক্সিকোর জুয়ান বাসাগুরেন।
৫. এই দেশগুলো প্রথমবার বিশ্বকাপ খেলছে।
৬. পাওলো রোসি।
৭. সবক'টি গোলই হেড দিয়ে করা।
৮. দক্ষিণ আফ্রিকা।

জবাব চাই

১. সুপারম্যানের কস্টিউমে কোন তিনটি রং দেখা যায়?
২. লিওনার্দো দা ভিঞ্চির আঁকা কোন বিখ্যাত ছবি এবার ৫০০ বছরে পা দিল?
৩. নতুন ছবি 'সুপারম্যান রিটার্নস'-এ সুপারম্যানের চরিত্রে কে অভিনয় করেছেন?

(উত্তর আগামী সংখ্যায়)

গত সংখ্যার জবাব চাই-এর উত্তর

১. ডেভিড বেকহ্যাম। ২. ব্রাজিল। ৩.পেলে।

সঠিক উত্তরদাতা

দীপ ঘোষ, ষষ্ঠ শ্রেণি, শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, রিষড়া, হুগলি; **শুভঙ্কর ঘোষ,** নবম শ্রেণি, মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন (মেন); **সৌরভ বসু,** অষ্টম শ্রেণি, হালিশহর রামপ্রসাদ বিদ্যাপীঠ, উত্তর চব্বিশ পরগনা; **ঋতম মেহেরা,** অষ্টম শ্রেণি, বোলপুর উচ্চ বিদ্যালয়; **স্বপ্না মেহেরা,** দশম শ্রেণি, বোলপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়; **সত্যেন্দ্র মণ্ডল,** অষ্টম শ্রেণি, রামপুরহাট উচ্চ বিদ্যালয়, বীরভূম; **রাতুল বন্দ্যোপাধ্যায়,** অষ্টম শ্রেণি, রামপুরহাট উচ্চ বিদ্যালয়, বীরভূম; **অভিষেক দাস,** অষ্টম শ্রেণি, ইলিয়স মেয়র স্কুল, কলকাতা; **শিল্পা দাস,** একাদশ শ্রেণি, কলকাতা গার্লস হাই স্কুল, কলকাতা; **অঞ্জনকুমার দাশ,** দ্বাদশ শ্রেণি, বিদ্যাসাগর বিদ্যাপীঠ মেদিনীপুর; **সুনন্দ সেন,** ষষ্ঠ শ্রেণি, মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম মাধ্যমিক বিদ্যালয়, রিষড়া, হুগলি; **কৃশানু চন্দ,** সাঁত্রাগাছি কেদারনাথ ইনস্টিটিউশন, হাওড়া; **পৃথ্বীশ বন্দ্যোপাধ্যায়,** দশম শ্রেণি, রামপুরহাট উচ্চ বিদ্যালয়, বীরভূম; **অর্কপ্রভ গঙ্গোপাধ্যায়,** ষষ্ঠ শ্রেণি, হুগলি কলেজিয়েট স্কুল; **দীপশুভ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,** পঞ্চম শ্রেণি, বালুরহাট

হাই স্কুল, দক্ষিণ দিনাজপুর; **অনন্যা রায়চৌধুরী,** গঙ্গারামপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, অষ্টম শ্রেণি, দক্ষিণ দিনাজপুর।

ই-মেলে যারা সঠিক উত্তর পাঠিয়েছে:

চৈতালি রায়, নবম শ্রেণি, নিউ ব্যারাকপুর কলোনি গার্লস হাই স্কুল, উত্তর২৪ পরগনা; **জয় ভৌমিক,** নবম শ্রেণি, দ্য সেন্ট্রাল মডার্ন স্কুল, ঘোলা কাজিপাড়া, বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগনা; **সায়ক চট্টোপাধ্যায়,** সপ্তম শ্রেণি, পাঠভবন, শান্তিনিকেতন। **ম্যাট্রিক চট্টোপাধ্যায়,** সপ্তম শ্রেণি, সাউথ পয়েন্ট হাই স্কুল, কলকাতা।

জবাব চাই-এর উত্তর পাঠানোর ঠিকানা:
আনন্দমেলা, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০১।
ই-মেল
anandamela@abpmail.com

হাট্টিমাটিমের ডিম

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

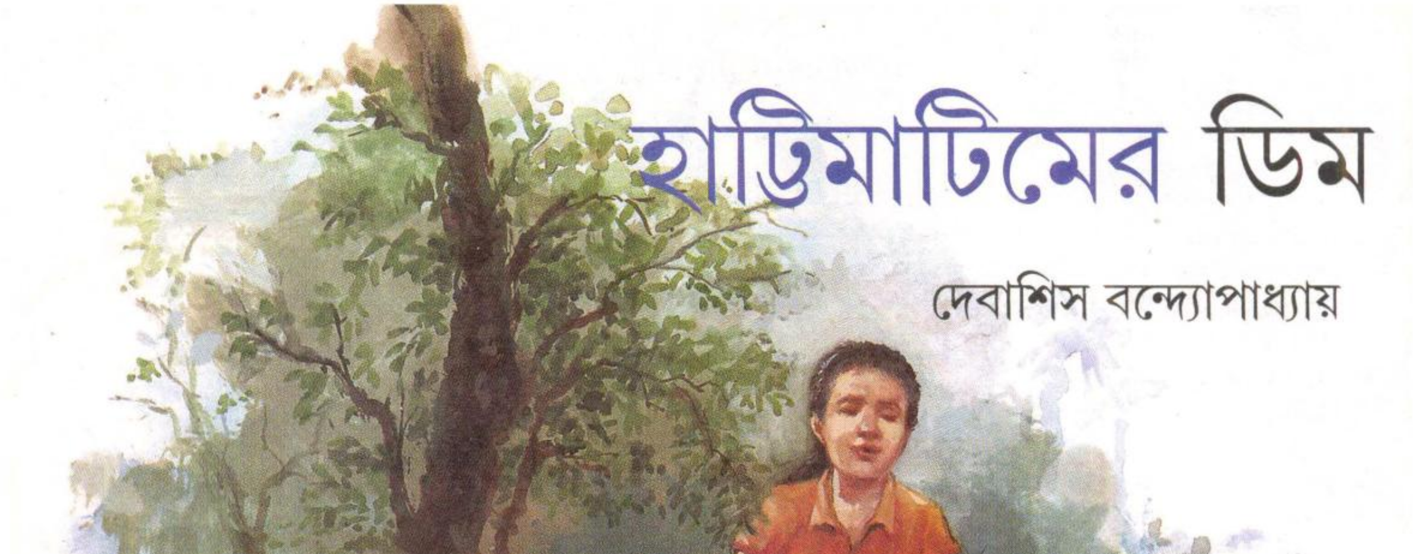

মিমিটা পোলট্রি ফার্মের পাশে থেকে-থেকে ওরকম মাথামোটা হয়ে যাচ্ছে। শুধু একে মুরগি করেছি, ওকে মুরগি করেছি বলে হাঁকডাক করা। এদিকে নিজেই যে কত বড় মুরগি হচ্ছে, সেকথা বুঝতে পারে না। কাল এসে বলে কিনা ও হাট্টিমাটিমের ডিম দেখেছে। পরশু ওর মামা এসেছিলেন। ওঁর খুব মাছ ধরার শখ। কাল দুপুরে মিমিকে সঙ্গে নিয়ে পদ্মদিঘিতে মাছ ধরতে গিয়েছিলেন। ব্যস, যা স্বভাব মিমির! এদিকওদিক ঘুরতে-ঘুরতে দিঘির ওপারে মাঠে গিয়ে দেখেছে, আলের পাশে একটা গোপন জায়গায় গোটা দশ-বারো ডিম। যেহেতু ছেলেবেলায় ছড়ায় পড়েছে, 'হাট্টিমাটিম টিম/তারা মাঠে পাড়ে ডিম/তাদের খাড়া দু'টো শিং/তারা হাট্টিমাটিম টিম'। তাই মাঠে যখন ডিম গড়াগড়ি দিচ্ছে, তখন তা অবশ্যই ওই বিটকেল নামের প্রাণীটার। কী সহজ সিদ্ধান্ত! আরে বাবা, ছড়ার প্রাণী কি বাস্তবে থাকে? কিন্তু কে বোঝাবে? এখন বিপদ আমার। কেননা, ওর মাথায় ভূত চেপেছে, ওরকম বিদ্‌ঘুটে একটা প্রাণী, যা কেউ কখনও দেখেনি, তাকে যদি এই সুযোগে আবিষ্কার করা যায় তো তাক লাগিয়ে দেওয়া যাবে সকলকে। লোকে আমাদের ধন্যধন্য করবে।

কত বোঝালাম, "ওরে, ওসব নয়। পাখির ডিম হবে হয়তো!" আর যায় কোথায়! সুযোগ পেয়ে গেল জ্ঞান দেওয়ার। পাখি কখনও মাঠে ডিম পাড়ে! পাখি নিজের বাসায় ডিম পাড়ে। কেন যে গবেটের মতো ভুলভাল মন্তব্য করে ফেলি! তারপর আর শোনে কথা? বললাম, "সাপের ডিম হলে বুঝবি ঠেলা।"

চোখ পাকিয়ে ভিতু বলে অপমান করল। প্রাইভেটের অঙ্ক পরীক্ষার খাতা দেখাবে না বলে হুমকি দিল। আর কিছু বলা যায়? দু' হপ্তার মধ্যে মুক্তিবাবু পরীক্ষা নেবেন। ফাইভে উঠে অবধি মিমিকে দিয়ে হোমওয়ার্ক করিয়ে নিয়ে কোনওরকমে ঠেকিয়ে রাখা হয়েছে। যা ভয়ানক মানুষ, কান টেনে লাল করে দেওয়ার পরও আবার গাঁট্টা পাকিয়ে বলবেন, "এ দিল মাঙ্গে মোর।" পরীক্ষায় একবার গোল্লা পেয়ে গেলে আর রক্ষে থাকবে! এত দিনের সব হোমওয়ার্ক কে করেছে, হাতে-হাতে ধরা পড়ে যাব।

অগত্যা রাজি হতেই হল। প্ল্যান এই যে, আজ দুপুরে পদ্মদিঘির ওপারের মাঠে যাওয়া হবে তদন্ত করতে।

পদ্মদিঘিটা গ্রামের একেবারে বাইরে। আশপাশে লোকবসতি নেই, তাই বড় ফাঁকা-ফাঁকা। সাধারণত ওদিকে কেউ যায় না। এক, যাদের জমি আছে, ওদিকে তারা চাষের মরশুমে যায়। আর যান মিমির মামার মতো মানুষরা, যাঁদের খুব মাছ ধরার নেশা। পদ্মদিঘিতে বড়-বড় মাছ আছে বলে শুনেছি, কিন্তু কাউকে ধরতে দেখিনি কখনও, মিমির মামাকেও না। যা ধরেছেন, ছোট-ছোট মাছ, বড়জোর চার-পাঁচশো গ্রাম ওজনের মাঝারি সাইজ়ের। ওই শুনশান পদ্মদিঘির পাড়ে দুপুরবেলা যাওয়া, ভাবলেই কেমন বুক ঢিপঢিপ করে। হায় ভগবান, আর কত দিন অঙ্কে কাঁচা থাকব, কে জানে! একটা আইডিয়া অবশ্য এসেছে মাথায়। একদিন তক্কে-তক্কে অঙ্কটা কার্বাইড দিয়ে পাকিয়ে নেব। পাঁচুদাকে চটপট কার্বাইড দিয়ে কলা পাকিয়ে নিতে দেখে এই বুদ্ধিটা খাটিয়েছি। পাঁচুদার কাছে অনেক কার্বাইড আছে। ফলের ব্যবসা করে তো। ওর কাছ থেকেই নেব। শুধু কার্বাইডটা কোথায় দিতে হবে, অঙ্কের বইয়ের খাতায় না মাথায়! একবার জানতে পারি! না জেনেশুনে দেওয়াটা ঠিক হবে না। মাথায় কার্বাইড দিলে শেষে যদি চুল পেকে যায়? যাচ্ছেতাই কাণ্ড হয়ে যাবে! তবে কদ্দিন আর! পাঁচুদার কাছ থেকে সঠিক ব্যবহারটা ভাল করে একবার জেনে নিই, তারপর মিমির কবল থেকে মুক্তি। তখন একা-একা যত খুশি গোয়েন্দাগিরি করো। আমি নেই ঝামেলায়! আজ বাই উঠবে, চল, টর্চ নিয়ে সন্ধেবেলা রাস্তাটা দেখে আসি, সন্দেহজনক কেউ ঘোরাঘুরি করছে কি না! তো, কাল বলবে দত্তদের পোড়ো বাড়িটায় ঢুকি চল, ওখানে কোনও সুড়ঙ্গের ম্যাপ পাওয়া যেতে পারে। ভয়ে হাত-পা ঠান্ডা হয়ে যায়। অথচ মুখ ফসকে বলে ফেললে 'ভিতু' বলে প্যাঁক দেবে!

দুপুর দু'টো বেজে গেল। মিমির আসার সময় হয়ে গিয়েছে। আসছে না কেন এখনও? বোধ হয় বাড়ির লোক আটকে দিয়েছে। যাক বাবা, তাই যেন হয়!

শেষবারের মতো একবার রাস্তাটা জানলা দিয়ে দেখে আসি। আরে ধুর! ওই তো মিমি আসছে! গলায় ওটা আবার কী ঝুলিয়েছে!

"কী রে গাবলু? একদম রেডি, খাওয়াদাওয়া করে?"

"হুঁ।"

"কাউকে বলিসনি তো?"

"না। এগুলো কী?"

"এই যে গলার এইটা, বাইনোকুলার। মামা দিল পরশু। এটা দিয়ে দূরের জিনিস দেখা যায়! আর, এটা লেন্স। কাছের জিনিস দেখার জন্য। এটাকে তুই আগেও দেখেছিস, দাদার বায়োলজি বক্স থেকে নিয়ে আসতাম।"

"একই সঙ্গে কাছ থেকে আবার দূর থেকে কী করে দেখবি?"

"এই দ্যাখ, তাও জানিস না? লেন্সটা তোর কাছে থাকবে। তুই দিঘির ওপাড়ে মাঠে গিয়ে কাছ থেকে ডিমগুলো ভাল করে লেন্স দিয়ে দেখবি! বাইনোকুলারটা আমার কাছে থাকবে। আমি ওটা দিয়ে রাস্তা থেকে তোকে দেখব, তুই ঠিকঠাক তদন্ত করছিস কি না? দিঘির ওপাড়টা বড্ড শুনশান, বুঝলি!"

"বা রে, আর আমার..."

"ভয় কী? আমি তো আছি। লক্ষ রাখছি তো তোকে বাইনোকুলার দিয়ে।"

॥ ২ ॥

শীতের দুপুর। আকাশটা আবার একটু মেঘলা করেছে। ডিমগুলো যারই হোক না কেন, তার উপর আমার খুব রাগ হচ্ছিল। কী আক্কেল! এই ঠান্ডায় কেউ মাঠে ডিম পাড়ে! লোকে চাদর মুড়ি দিয়ে ঘরে বসে আছে। কনকনে মেঠো হাওয়ায় সারাজীবন তা দিলেও গরম হবে ওই ডিম? জন্মেও ছানা ফুটবে না ওই ডিম থেকে। রাস্তা দিয়ে পদ্মদিঘির দিকে যেতে প্রথমে মিমিদের বাড়ি। তারপর মজুমদারদের পোলট্রি ফার্ম। ফার্মের পাশ দিয়ে যেতে-যেতে সাদা ধবধবে মুরগির বাচ্চাগুলো তারের ঘেরাটোপের মধ্যে দেখা যায়। যেন শরতের চঞ্চল সাদা মেঘের ছোটখাটো একটা দলকে ধরে এনে রেখে দিয়েছে। তারা ওপার থেকে তারের ফাঁক দিয়ে মানুষজনকে দ্যাখে, আর কিচিরমিচির করে শিউলি, শিশির এই শব্দগুলো দিয়ে শরতের বাউলগান বাঁধে। মজুমদারদের ছোট ছেলেটা, আমাদের ক্লাসেই পড়ে। মাথামোটা বলে সকলে ওকে 'ঢ্যাঁড়স' নামে ডাকে। ও মুরগিগুলোকে খুবই যত্ন করে। প্রায়ই দেখি, মন দিয়ে দানা ছড়াচ্ছে, জল পালটে দিচ্ছে।

চলতে-চলতে যখন পদ্মদিঘির সামনে চলে এলাম, তখন চারপাশটা আরও ছায়া-ছায়া হয়ে এল। কেমন যেন গা ছমছম করতে লাগল। লোকে বলে, ও-পাড়ের বেলগাছটায় ব্রহ্মদৈত্য আছে। যেখানে মিমি ডিম দেখছিল, সেই মাঠে পৌঁছতে হলে ওপারে গিয়ে ওই বেলগাছটার নীচ দিয়ে যেতে হবে। মিমির চক্করে পড়ে আজ প্রাণটা না যায়!

"মিমি রে, ওই বেলগাছটা কেমন যেন নড়ে উঠল।"

"মজা করছিস তো?"

"না, সকলে বলে ওটায় ব্রহ্মদৈত্য আছে।"

"থাকুক! সে তো বাড়িতেও মা-ঠাকুরমা আছেন। কেউ তা উল্লেখ করে কথায়-কথায়! ব্রহ্মদৈত্য যদি গাছে সংসার নিয়ে থাকে থাক না, আমাদের দুশ্চিন্তার কী আছে!"

"না, বলছিলাম ডিমগুলো যদি ব্রহ্মদৈত্য এনে থাকে সিদ্ধ করে খাবে বলে, আমাদের বাগড়া দেওয়া কি ঠিক হবে?"

"ছিঃ গাবলু, ব্রহ্মদৈত্য না বামুন? ডিম খাবে কী! ওরা নিরামিষ খায়!"

"তুই ঠিক জানিস?"

"অবশ্যই। ভূতদের মধ্যে ভীষণ নিয়মনিষ্ঠা। দেখিস না, মটকালে শুধু ঘাড়ই মটকায়। কারও হাত-পা মটকে দিয়েছে বলে শুনেছিস কখনও?"

"না।"

"তবে? চল, এবার পা চালা মাঠের দিকে। আমি বাইনোকুলারটা ফোকাস করে লক্ষ রাখি তোকে। যা ভিতু ছেলে তুই। তেমন গোয়েন্দা হলে তোর একাই এসব দেখে গিয়ে আমাকে রিপোর্ট দেওয়ার কথা।"

॥ ৩ ॥

মিমিকে পিছনে ফেলে যতই এগিয়ে যাচ্ছিলাম, ততই ভয় বেড়ে যাচ্ছিল আমার। মাঝে-মাঝে তাই মিমিকে এক-একবার পিছন ফিরে দেখে নিচ্ছিলাম।

বেলগাছ পর্যন্ত যেতে হল না। মিমি যে জায়গাটায় ডিমগুলো দেখেছিল বলে আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিল, সেখানে স্পষ্ট দেখতে পেলাম, কে যেন ঘোরাঘুরি করছে। ছোটখাটো একটা মানুষের মতো। এ নির্ঘাত ব্রহ্মদৈত্যের ছোট ছেলে। আমি দৌড় লাগালাম মিমির দিকে। বুকটা ধড়াস-ধড়াস করতে লাগল। সেই শব্দে পিছন-পিছন কেউ পা ফেলে আসছে মনে করে আমি আরও জোরে ছুট লাগালাম। মিমি কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু আমাকে ছুটতে দেখে ও আমার সঙ্গে রাস্তার দিকে ছুট দিল। হাঁপাতে-হাঁপাতে রাস্তায় এসে মিমিই প্রথম কথা বলল, "কী রে, কী হয়েছিল?"

"মিমি, ভূতের বাচ্চা। ডিম খাচ্ছে। মনে হয়, ডাক্তার বলেছে ডিম খেতে। অমন হাড়-লিকলিকে শরীরে গত্তি লাগবে বলে।"

"ক'টা?"

"একটা। ছোট। আমাদেরই মতো লম্বা হবে।"

"হাট্টিমাটিমও তো হতে পারে।"

"ওসব নয়। চল, পালাই এখান থেকে, না হলে আমাদের ঘাড় মটকে..."

আমি আর-একটু এগিয়ে যাই রাস্তা ধরে।

"থাম, অত পালাই-পালাই করলে গোয়েন্দাগিরি হয় না। আয়, ওই উঁচুটা থেকে বাইনোকুলার দিয়ে দেখি একবার। যদি হাট্টিমাটিম হয়? শিং আছে কিনা দেখেছিস?"

"না, নেই। ও শিওর ভূতের বাচ্চা। কোনও বিদ্‌ঘুটে প্রাণী নয়।"

"তুই সব জানিস। শিং হয়তো নিজেদের মধ্যে গুঁতোগুঁতি খেলতে গিয়ে ভেঙে ফেলেছে। চল, দেখি আগে খতিয়ে।" মিমি হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল মাটির ঢিপিটার উপর। দিঘির জলে অল্প-অল্প ঢেউ দিচ্ছিল। এই সময় দিঘির পাড় বেশিরভাগটাই ঘাসের আস্তরণে মোড়া থাকে। বর্ষাকালে লম্বা-লম্বা বুনো গাছে ভরে যায়। এখন বনজঙ্গল কম, দু'-এক জায়গায় বিচ্ছিন্ন ঝোপঝাড় ছাড়া। ঢিপির উপর থেকে মাঠটা পরিষ্কার দেখা যায়। কেউ রয়েছে, এটা বোঝা যাচ্ছিল। মিমি বাইনোকুলার দিয়ে খানিকক্ষণ দেখল, তারপর বলল, "চল, ওখানে যাই। ব্যাপারটা রহস্যজনক মনে হচ্ছে।"

"মিমি, ওখানে না গেলেই নয়? সত্যি যদি ঘাড় মটকে দেয়, তখন কী হবে?"

"কিছুই হবে না, শুধু মট করে একটা শব্দ হবে, ব্যস। তবে গাবলু, আবার যদি এমন ভয় পাস তো, মুক্তিস্যারকে বলে দেব তোর হোমওয়ার্কের রহস্য।"

মিমির সঙ্গে-সঙ্গে যাচ্ছিলাম বটে, কিন্তু পা যেন সরছিল না। যদি আজ বেঁচে ফিরি, কাল কার্বাইড দেবই অঙ্কে পাকা হতে। অঙ্ক, বই-খাতা আর মাথা, দু'জায়গাতেই দেব।

"আরে, ওটা আমাদের ঢ্যাঁড়সটা নয়?"

মিমির কথায় চমকে উঠে সামনে তাকালাম! হ্যাঁ, ঢ্যাঁড়সই তো! ঝুঁকে পড়ে কী করছে মাঠে!"

"চল গাবলু, ছুটে গিয়ে চেপে ধরি।"

আমরা কাছে গিয়ে চেপে ধরতেই থতমত মুখে ঢ্যাঁড়সটা বলে কিনা, "কিছু না, এমনি ঘুরতে এসেছিলাম।" অথচ একটু আগেই ছুটে পালাতে যাচ্ছিল, আমাদের আসতে দেখে।

মিমি বলল, "আমাদের বল, কী হয়েছে? মাঠের মাঝখানে তুই ডিম লুকিয়ে রাখতে এসেছিস কেন?"

ঢ্যাঁড়স চুপ করে থাকে। আমার যেন কেমন-কেমন সন্দেহ হয়। ব্রহ্মদৈত্যটা ঢ্যাঁড়স দিয়ে ডিম আনায় না তো? আহা রে, ওকে বোকা পেয়ে বোধ হয় ভয় দেখিয়ে খাটিয়ে নিচ্ছে!

মিমি ঢ্যাঁড়সটাকে আবার ধমক দিয়ে বলে, "কী রে, কথা কানে যাচ্ছে না? এখানে ডিম নিয়ে কেন এসেছিস?"

"ডিমগুলোকে ছেড়ে দিতে।"

"ছেড়ে দিতে মানে?"

"মুরগির বাচ্চাগুলোকে তো ছেড়ে দিতে পারি না। বাবা গুনে-গুনে রাখেন। ওরা বাইরে-বাইরে ঘুরেই ভাল থাকবে, তাই না? কিন্তু বাবা ওদের খাঁচায় ভরে রাখেন। আমি ওদের খেতে দিতে গিয়ে দেখেছি, ছটফট করে মাঝে-মাঝে। আটকে থাকতে ওদের খারাপ লাগে, বুঝতে পারি। তাই ইচ্ছে হয়, যাই ছেড়ে দিই।"

আমি তো হাঁ। মিমি অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাল, আড়চোখে।

ঢ্যাঁড়স বলছিল, "অনেক ডিম হয়। গুনে রাখে না ঠিকমতো। তাই কিছু সরিয়ে ছেড়ে দিয়ে গিয়েছি মাঠে। ফুটে গেলে একেবারে ফাঁকা মাঠ পাবে চরে বেড়াতে।

॥ ৪ ॥

ঢ্যাঁড়সকে ছেড়ে দেওয়াই হল। আমার খুব ভৎর্সনা করতে মন চাইছিল। কিন্তু মিমি ওকে কিছুই বলল না। মাথায় হাত বুলিয়ে ছেড়ে দিল। তাই আমারও কিছু বলা হল না। অবশ্য যা ভয় পেয়েছে বেচারা ধরা পড়ে গিয়ে! মরার উপর আর খাঁড়ার ঘা না দেওয়াই ভাল।

হায় রে, সাধে কি আর লোকে ঢ্যাঁড়স বলে ডাকে! ডিম কি আপনাআপনি ফোটে! এতদিন মুরগি পালন করে এই শিক্ষা হয়েছে! একদম কাঁচা বুদ্ধি। এইমাত্র একটা দারুণ আইডিয়া মাথায় এল। কার্বাইডটা ঢ্যাঁড়সের উপর একবার টেস্ট করলে হয় না? ওর বুদ্ধি পাকে কি না! সফল হলে, অঙ্কের জন্য নিজের উপর ব্যবহার করা যাবে না হয়!

ছবি: নির্মলেন্দু মণ্ডল

আজকে বেড়াতে বেড়িয়ে কি আগের রাতে ফিরে আসা যায়?
উত্তর পেতে হলে অবশ্যই পড়তে হবে সম্পূর্ণ রঙিন
রিলেটিভিটির মজা
দাম : ৪০ টাকা • লেখক : পার্থসারথি চক্রবর্তী যাঁর বই
মাত্রেই মজার বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের মজা।
আইনস্টাইনের রিলেটিভিটি ছোটদের জন্য
জলের মতো সহজ করে গল্প দিয়ে লেখা।
ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস • ফোন: ২২৪৪-৫৯২৪, ২২২৭-২৩৩৬
পাবেন : দে বুক স্টোর, বুক ফ্রেন্ড, আদি নাথ ব্রাদার্স, চক্রবর্তী-চ্যাটার্জি, সর্বোদয়

মাধ্যমিকে অঙ্কে লেটার মার্কস পেতে
এই বই অবশ্যই পড়তে হবে
নবম-দশম
গণিত
অমিতাভ মিত্র
১৪০/-
এখন ইংরাজীতেও পাওয়া যাচ্ছে
SCHOOL MATHEMATICS
AMITAVA MITRA
140/-
New Book Syndicate
35 College Street, Kolkata 700 073 ✆ : 2257 0754

আমার সম্পাদক শিকার

দু'সংখ্যায় সমাপ্য মজাদার কমিক্স
(প্রথমাংশ এই সংখ্যায়)

গল্প: শিবরাম চক্রবর্তী

ছবি: সৌরভ মুখোপাধ্যায়

আরে থাক, থাক। কে তুমি, মানে আপনি?
আমাকে 'আপনি' বলবেন না দয়া করে। আমি আপনার একজন গুণমুগ্ধ ভক্ত।
ও আচ্ছা-আচ্ছা, কী নাম তোমার?
আজ্ঞে, শিবরাম চক্রবর্তী। একটুআধটু লেখালিখি করার চেষ্টা করি। সবই আপনার উৎসাহে, অনুপ্রেরণায়।
আমার উৎসাহে, অনুপ্রেরণায়? বলো কী!
মানে, আপনার। মানে, আপনার লেখার। আপনার লেখা যেদিন থেকে পড়তে শুরু করেছি, আমি আর অন্য কিছু ভাবতে পারি না। কেমন জলের মতো বোঝা যায় আপনার লেখা, অথচ বোঝার মতো মাথায় চাপে না, রবিঠাকুরের লেখার মতোই।
রবিঠাকুর, মানে, রবীন্দ্রনাথ?
আজ্ঞে, আমার মতে আপনি রবীন্দ্রনাথের চেয়েও বড় লেখক! দয়া করে এই লেখাটা একটু দেখুন!
খক, খক ওয়াক!
এটা আমার সর্বপ্রথম এবং একমাত্র লেখা। আশা করি আপনার ভাল লাগবে!
শোনো ভাই, লেখা এখন দেখাতে হবে না। আমিও আমার লেখা কাউকে কোনওদিন পড়াইনি, শুধু পাঠকদের ছাড়া। আমি আশীর্বাদ করছি, তোমার হবে!

লেখা শেষ
ওফ, অ-সা-ধা-র-ণ! লেখাটা যা হয়েছে না, একেবারে তোলপাড় হয়ে যাবে!
আমাকে আশীর্বাদ করুন, সম্পাদকদের যেন পছন্দ হয়!
এবার শুধু পত্রিকার অফিসগুলোয় লেখাটা পাঠিয়ে দেওয়া। সম্পাদকরা একেবারে তাজ্জব বনে যাবে।
কয়েকদিন পর...
আপনার জন্য এই চিঠিগুলো আছে! নিন!
আমার জন্য?
এ কী! এ তো দেখছি আমার লেখাটাই! সব জায়গা থেকে ফেরত এসেছে।
আরও কয়েকদিন পর...
নাঃ, ছোট-বড় মাসিক, পাক্ষিক— কলকাতার সব কাগজ থেকে একই উত্তর!

'গুরুগম্ভীর' দৈনিক কাগজটায় দিলে কেমন হয়? যদিও এই ধরনের লেখা ছাপার উপযুক্ত কাগজ নয়, তবুও...
কিন্তু কয়েকদিন পর আবার...
মহাশয়, আপনার লেখাটি আকার-আয়তনে অতি দীর্ঘ। আমাদের পত্রিকায় জায়গা কম থাকার জন্য এটি ছাপতে আমরা অক্ষম। দুঃখিত। সম্পাদক
কী আশ্চর্য ব্যাপার! প্রতিদিন দেখছি কাগজে পাতার পর পাতা কত আজেবাজে বিজ্ঞাপন ছাপা হয়, আর আমার লেখার বেলায় স্থানাভাব!
শহর, মফস্সল সব জায়গার পত্রিকায় লেখা পাঠানো হল, কিন্তু সব শেয়ালের একই রা!
কিছুদিন পর...
আরে, এটা কোন কাগজ! 'মেদিনীপুর কৃষিতত্ত্ব'! এরকম একটা কাগজ আছে জানতাম না তো!
কৃষি-পত্রিকা! একেবারে চাষবাসের ব্যাপার! কিন্তু উপায় যখন নেই, অনেক জায়গাতেই তো পাঠালাম, কোথাও ছাপা হল না। এখানে একবার দেখতে হবে!
পরদিন ট্রেনে চেপে সোজা মেদিনীপুর...
ওই তো কাগজের অফিস! কী বিচ্ছিরি অবস্থা! যাই, ভিতরে গিয়ে দেখি!
ঘরে ঢুকে...
লেখাটার চূড়ান্ত অসম্মান হবে, বোঝাই যাচ্ছে! দেখা যাক কী হয়!

আপনিই সম্পাদক, না? আমি একটা লেখা এনেছিলাম! দয়া করে যদি একটু পড়ে দেখেন, তা হলে বাধিত হই!
কই, দেখি!
এটা একটা গল্প। গল্পটার থিম, প্লট সব একেবারে নতুন ধরনের। যদি পড়ে দেখেন, তা হলেই বুঝতে পারবেন!
পুরোপুরি নতুন স্টাইলে লেখা! আশা করি আপনার পছন্দ হবে!
গল্প পড়া শুরু হল...
মন দিয়ে পড়ে যাও! তারপর বোঝো এবার, কেমন লেখা!
হুঁ, পড়ে দেখলাম, মন্দ হয়নি! তবে, এটা যে একটা গল্প, তা জানা গেল। আপনি গল্পের নামের পাশে ব্র্যাকেটের মধ্যে কথাটা লিখে দিয়েছেন বলে! না হলে বোঝার কোনও উপায় ছিল না!
তা বটে! আপনারা সম্পাদকরা যদি আমাদের মতো লেখকদের লেখা ছাপেন, তবেই আমরা, নতুন লেখকরা উৎসাহ পাই!
হুঁ, তা আপনি ঠিকই বলেছেন!

গল্পটা তা হলে ভাল লেগেছে আপনার? খুব আনন্দ হচ্ছে আমার!
অ্যাঁ?
ভাল লেগেছে গল্পটা?
লেগেছে একরকম! তা এটা কি...
হ্যাঁ, হ্যাঁ, অনায়াসে। আপনার কাগজের জন্যই তো এনেছি লেখাটা! আপনি নিশ্চিন্ত মনে ছাপতে পারেন এটা। পাঠকদের দারুণ লাগবে গল্পটা!
আমার কাগজের জন্য এনেছেন এই লেখাটা?
অবশ্যই তাই!
আপনি এর আগে কখনও লিখেছেন?
নাঃ, আগে কোথাও লিখিনি। এই আমার প্রথম চেষ্টা!
উঠে দাঁড়িয়ে একটু পায়চারি করে...
প্রথম চেষ্টা? বটে? খুব ভাল। আপনার ঘড়িতে এখন ক'টা বাজে?
ঘড়ি দেখতে গিয়ে...
ওঃ হোঃ! একেবারেই খেয়াল করিনি। ঘড়িটা তো বন্ধ! খারাপ হয়ে গিয়েছে মনে হচ্ছে!
দুঃখিত! আসলে ঘড়িটা ক'দিন ধরেই মাঝে-মাঝে গন্ডগোল করছে! সারানো হয়নি আরকি!
তাই নাকি? দেখি একবার! যদি সারাতে পারি!

সম্পাদনা করেন, আবার ঘড়ি মেরামতিও জানেন নাকি আপনি?
জানি বলেই তো মনে হয়। দেখি, সারানো যায় কি না! দিন, ঘড়িটা দিন!
এই নিন, দেখুন! যদি সারিয়ে দিতে পারেন!
ঘড়ি সারাইয়ের দোকানে দিলেই এখন অনেক টাকা খরচ। যদি নিখরচায় ঘড়ি আর লেখা, দু'টোই একসঙ্গে চালিয়ে যাওয়া যায়, মন্দ কী?
কিন্তু...
!?
ঘটাং...
ভেঙে গেল। তবে ভয় পাবেন না! জুড়ে দেব আবার!
চেষ্টা করে দেখতে দোষ কী?
একটা আঠার শিশি এনে...
এর পর...
খটাং
ঘড়ির বড় জুয়েলটা মুখে পুরে...কটাশ...
জুয়েলটা গেল! কী হবে এবার! ঘড়িটার বারোটা বাজল বোধ হয়!
অনেক চেষ্টা করে দেখলাম। অনেকটা সময়ও গেল। এই নিন, আপনার ঘড়ি...

এ...এটা কী হল মশাই? এই আপনার ঘড়ি সারানো?
কেন? একথা বলছেন কেন? মেরামতি করে দিয়েছি তো!
এই বুঝি আপনার ঘড়ি মেরামত করা? আপনি যদি ঘড়ির কিছু না জানেন, তবে হাত দিতে গেলেন কেন? ঘড়িটার সর্বনাশ হয়ে গেল!
কেন? কী ক্ষতি হয়েছে? ভাল করতে গিয়ে খারাপ হয়ে গেলাম! আর তা ছাড়া, এটা আমারও প্রথম চেষ্টা!
!!!
ওঃ, আমার প্রথম লেখা বলেই আপনার পছন্দ হয়নি? তা, বললেই পারতেন! ঘড়ি ভেঙে একথা বলা কেন? কাল না হয় একটা নতুন গল্প লিখে আনব, তখন বুঝবেন!
নিশ্চয়ই আনবেন। কিন্তু তার সঙ্গে আর-একটা নতুন ঘড়িও আনবেন মনে করে! তাতে আমাদের দু'জনেরই লাভ!
কীরকম?
নতুন লেখার সঙ্গে নতুন ঘড়ি আনলে আপনারও লেখায় হাত পাকবে, আর আমিও ঘড়ি সম্পর্কে পরিপক্কতা লাভ করব!

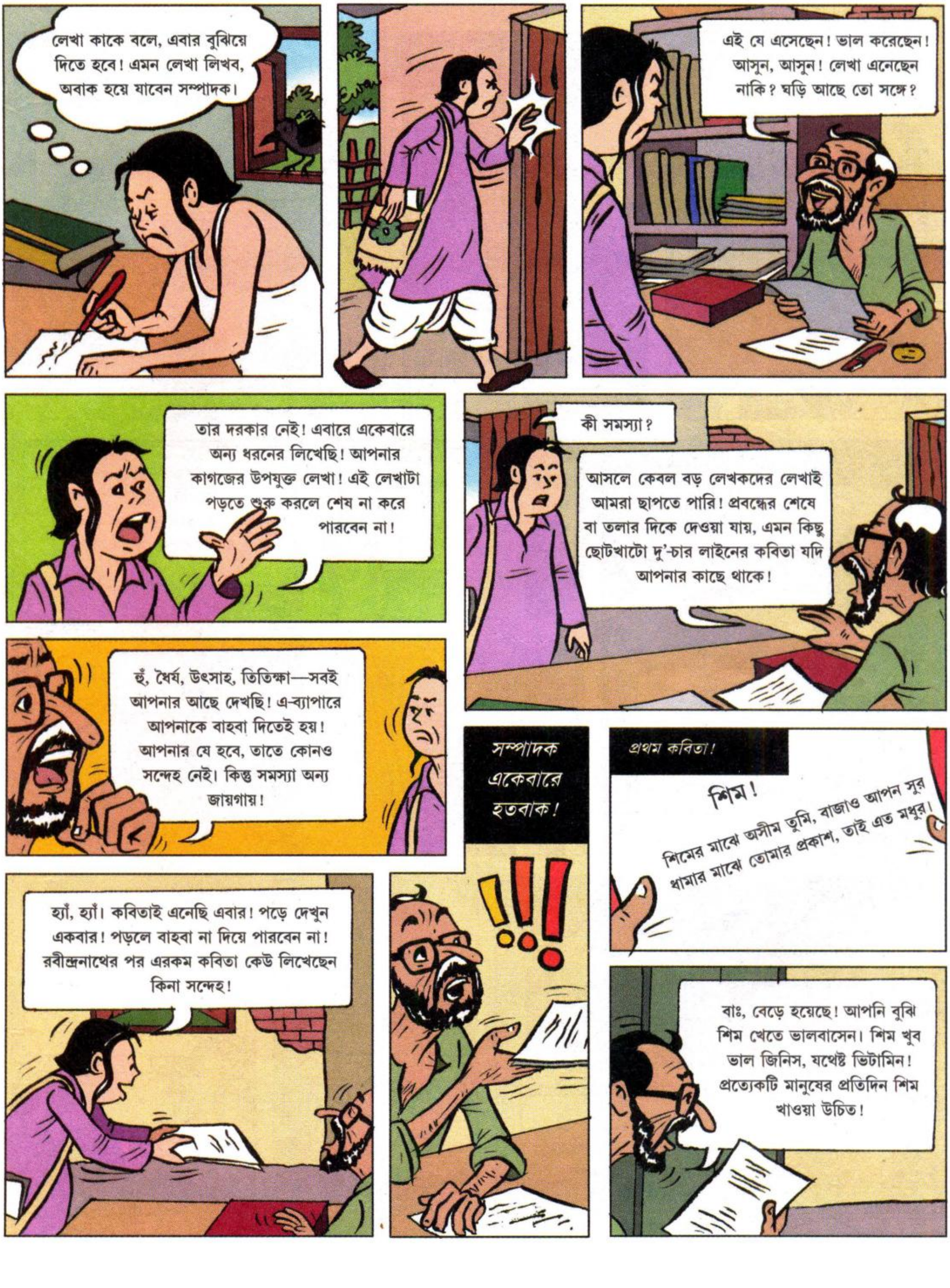
লেখা কাকে বলে, এবার বুঝিয়ে দিতে হবে! এমন লেখা লিখব, অবাক হয়ে যাবেন সম্পাদক।
এই যে এসেছেন! ভাল করেছেন! আসুন, আসুন! লেখা এনেছেন নাকি? ঘড়ি আছে তো সঙ্গে?
তার দরকার নেই! এবারে একেবারে অন্য ধরনের লিখেছি! আপনার কাগজের উপযুক্ত লেখা! এই লেখাটা পড়তে শুরু করলে শেষ না করে পারবেন না!
হুঁ, ধৈর্য, উৎসাহ, তিতিক্ষা—সবই আপনার আছে দেখছি! এ-ব্যাপারে আপনাকে বাহবা দিতেই হয়! আপনার যে হবে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু সমস্যা অন্য জায়গায়!
কী সমস্যা?
আসলে কেবল বড় লেখকদের লেখাই আমরা ছাপতে পারি! প্রবন্ধের শেষে বা তলার দিকে দেওয়া যায়, এমন কিছু ছোটখাটো দু'-চার লাইনের কবিতা যদি আপনার কাছে থাকে!
হ্যাঁ, হ্যাঁ। কবিতাই এনেছি এবার! পড়ে দেখুন একবার! পড়লে বাহবা না দিয়ে পারবেন না! রবীন্দ্রনাথের পর এরকম কবিতা কেউ লিখেছেন কিনা সন্দেহ!
সম্পাদক একেবারে হতবাক!
প্রথম কবিতা!
শিম!
শিমের মাঝে অসীম তুমি, বাজাও আপন সুর
ধামার মাঝে তোমার প্রকাশ, তাই এত মধুর।
বাঃ, বেড়ে হয়েছে! আপনি বুঝি শিম খেতে ভালবাসেন। শিম খুব ভাল জিনিস, যথেষ্ট ভিটামিন! প্রত্যেকটি মানুষের প্রতিদিন শিম খাওয়া উচিত!

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

ডাফ হাই স্কুল ফর গার্লস

(কলকাতা)

বিজ্ঞান, হস্তশিল্পসহ বিভিন্ন আকর্ষক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয় এই উপলক্ষে।

বেড়াতেও যাই

প্রতি বছর আমাদের স্কুল থেকে শিক্ষামূলক ভ্রমণের উদ্যোগ নেওয়া হয়। সায়েন্স সিটি, ব্যান্ডেল চার্চ, ইমামবাড়া, বিড়লা ইন্ডাস্ট্রিয়াল মিউজিয়াম, কলকাতা প্যানোরামা প্রভৃতি জায়গায় আমাদের নিয়ে যাওয়া হয়।

আমাদের স্কুল

উনিশ শতকের নবজাগরণে বাংলার শিক্ষাজগতে যাঁর অবদান ভোলা যায় না, তিনি হলেন স্কটল্যান্ডের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ রেভারেন্ড আলেকজান্ডার ডাফ। আমাদের স্কুলটি তৈরি হয় তাঁর উদ্যোগেই, তিনিই এই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা। ১৮৫৭ সালের ১৩ মার্চ মাত্র ৬২ জন ছাত্রীকে নিয়ে আমাদের স্কুলটি তৈরি হয়। আজ আমাদের স্কুলে প্রায় ১,২০০ ছাত্রী পড়াশোনা করে। উত্তর কলকাতার প্রাণকেন্দ্র শ্যামপুকুর-শ্যামবাজার অঞ্চলে আমাদের স্কুলটি অবস্থিত। ২০০৬ সালেই আমাদের স্কুলের সার্ধশতবর্ষ পালন করা হবে। এই বছর স্কুলটি উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে উন্নীত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। আমাদের স্কুলের প্রাক্তন প্রধানশিক্ষিকা মাননীয়া হিরণপ্রভা বোস জাতীয় শিক্ষিকার সম্মান পেয়েছেন।

মিলনমেলার আনন্দে

মেলা মানেই আনন্দের সমারোহ, মেলা মানেই মানুষের মিলনক্ষেত্র। এই উদ্দেশ্য সফল করে তুলতে বেশ কয়েক বছর ধরেই আমাদের স্কুলে 'আনন্দমেলা'-র আয়োজন হচ্ছে।

উৎসবের উৎসাহে

উৎসব হল আনন্দক্ষেত্র। এই উৎসবের উৎস সন্ধানে আমরা প্রতি বছর উৎসাহী হয়ে উঠি। প্রতি শিক্ষাবর্ষের শুরুতেই আমরা রবীন্দ্রজয়ন্তী পালন করি, স্বাধীনতা দিবসও পালন করি। এর পর রয়েছে শিক্ষক দিবস। এই দিন শিক্ষিকাদের আমরা আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা জানাই। এর পর রয়েছে বড়দিন বা ক্রিসমাস। সত্যিই এই দিনটি খুবই আনন্দের। আমাদের স্কুলে সবচেয়ে আনন্দের দিন এই ২৫ ডিসেম্বর। সব শেষে রয়েছে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান।

লেখাগুলো লিখেছে **শর্মিষ্ঠা বন্দ্যোপাধ্যায়, পায়েল দে ও সুমনা চট্টোপাধ্যায়,** এরা সকলেই *নবম শ্রেণির ছাত্রী।*

শিকারবাড়ি রহস্য

শুভমানস ঘোষ

ছবি: অনুপ রায়

ভদ্রলোকের বয়স চল্লিশ-বিয়াল্লিশ হবে। লম্বা-চওড়া চেহারা, পোড়া-পোড়া গায়ের রং, বসা-বসা চোখ, পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি। শহর থেকে লোকজন এসেছে শুনে, সৌমিতাদের সঙ্গে আলাপ করতে এসেছেন। ভদ্রলোক বাংলাতেই কথা বলছিলেন, কিন্তু কেমন একটা টান। সৌমিতা ওর ছোটকাকার কাছে পরে শুনেছিল, একে বলে মোটা বাংলা।

"নমস্কার। আমার নাম পর্বত গড়াই।"

ছোটকাকা প্রতিনমস্কার করে বললেন, "অনুগ্রহ করে নামটা আর-একবার বলবেন?"

"আজ্ঞে, পর্বত গড়াই," বলতে-বলতে ভদ্রলোক হেসে ফেললেন, "আমার নামটা আপনাদের কাছে অদ্ভুত ঠেকছে, বুঝতে পারছি। কিন্তু আমার কিছু করার নেই। বাবা-মা আমাকে ওই নামই দিয়েছেন।" বলে ভদ্রলোক নিজের আর যে পরিচয় দিলেন, তাতে জানা গেল, উনি এই অঞ্চলের পুরনো লোক। এখানকার এক প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকতা করেন। সামান্য কিছু জমিজমাও আছে।

"এখানেও মাস্টারমশাই!" ছোটভাই তাতান কানে-কানে ফিসফিস করে উঠল সৌমিতার।

তাতান খেলাধুলোয় যতটা এক্সপার্ট, পড়াশোনায় ততটা নয়। তাই বেড়াতে এসে মাস্টারমশাইয়ের মুখোমুখি পড়ে যাওয়া ওর পক্ষে মোটেই স্বস্তিদায়ক নয়। সৌমিতা অনেক কষ্টে হাসি চেপে, ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বলল, "চুপ!"

এখন বেলা চারটে। 'সৃষ্টিছাড়া অ্যাডভেঞ্চার ক্লাব'-এর সদস্যরা সবে পাহাড়জঙ্গলে ঘেরা এই মনোরম লালতটিতে এসে পৌঁছেছে। লালতটি এখনও পর্যন্ত অপরিচিত একটা টুরিস্ট স্পট। বছর দশেক আগে সৌমিতার ছোটকাকা রজত দত্ত একবার এখানে এসেছিলেন। তখন এসব অঞ্চলে ঘন জঙ্গল। যে ড্যামটার জন্য এটা এখন টুরিস্ট স্পটের মর্যাদা পেয়েছে, সেটা তখনও তৈরি হয়নি।

সৌমিতার ছোটকাকাই সৃষ্টিছাড়া অ্যাডভেঞ্চার ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা। স্থায়ী ও শিক্ষানবিশ সদস্য নিয়ে এখনও পর্যন্ত ক্লাবের সদস্যসংখ্যা মাত্র পাঁচ। এদের মধ্যে সৌমিতা ও তার ভাই তাতান ছাড়াও আছে বাবলি বলে একটি মেয়ে ও পপাই বলে একটি ছেলে। সৌমিতারা যে ফ্ল্যাটবাড়িতে থাকে, বাবলিরা থাকে তারই টপ ফ্লোরে। আর পপাই থাকে তাদেরই পাড়ায় কয়েকটা বাড়ি পরে। এদের মধ্যে তাতান আর বাবলি এখনও ক্লাবের শিক্ষানবিশ।

সৃষ্টিছাড়া অ্যাডভেঞ্চার ক্লাবের মূল লক্ষ্য অ্যাডভেঞ্চার। কিন্তু এই অ্যাডভেঞ্চারের সঙ্গে সাধারণ অ্যাডভেঞ্চারের কিছুটা পার্থক্য আছে। সাঁতার কেটে গঙ্গা পারাপার করা, গ্রামের নির্জন শ্মশানে রাত কাটিয়ে আসা, মাঝরাতে রাস্তার কুকুর আর পুলিশ সামলে মাইলের পর-মাইল হেঁটে যাওয়া, প্রচণ্ড গরমে লু-এর মধ্যে পাহাড় টপকানো, পাহাড়ি নদীর উৎস আবিষ্কার— এই রকম সব সৃষ্টিছাড়া অ্যাডভেঞ্চার তাদের। শুনে লোকজন পাগল বলে হাসাহাসি করলেও, এরা গায়েই মাখে না।

লালতটিতে এখনও পর্যন্ত ঠিক কী নিয়ে অ্যাডভেঞ্চার হবে, তা ছোটকাকা ঠিক করে উঠতে পারেননি। এই মাস্টারমশাই হেল্প করতে পারেন, এই ভেবে তাঁকে ঘরে নিয়ে এসে খাতির করে বসালেন। সৌমিতারা ঘিরে দাঁড়াল তাঁকে।

সৌমিতারা এসে উঠেছে বনবিভাগের সুন্দর সুসজ্জিত ইনস্পেকশন বাংলোয়। ভারী চমৎকার জায়গায় বাংলোটা। এক দিকে সুবিস্তীর্ণ জলাধার, অন্য দিকে পাহাড়ের বিশাল গড়ান। অ্যাডভেঞ্চার ক্লাবের পপাইয়ের বাবা বনমন্ত্রকের বড় অফিসার। তিনিই থাকার জন্য এদের এই বাংলোটা ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। পপাইয়ের বাবা-মা'রও এখানে আসার কথা ছিল, কিন্তু শেষ মুহূর্তে সেটা ক্যানসেল হয়। তবে সৌমিতাদের সঙ্গে এসেছেন সৌমিতার বাবা-মা। তাঁরা ঘরদোর গোছগাছ করছিলেন। ছোটকাকা মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে তাঁদের পরিচয় করিয়ে দিলেন।

"আপনি মাস্টারমশাই?" ভদ্রলোকের পরিচয় পেয়ে বাবা ভারী উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। সৌমিতার বাবার চেহারা ছোটকাকারই কাছাকাছি। লম্বা, পেটানো স্বাস্থ্য, কাটা-কাটা মুখচোখ, মাজা-মাজা রং। তবে তাঁর গলার স্বর ছোটকাকার মতো অতটা ভারী নয়। ভদ্রলোককে একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে, বাবা নিজে আধাগোছানো বিছানায় বসে বললেন, "তা হলে তো ভালই হল। আপনি আমাদের ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিতে পারবেন সব। আপনাদের এখানে দেখার কী-কী জিনিস আছে বলুন তো?"

অ্যাডভেঞ্চার ক্লাবের সদস্য না হলেও বাবাও কম যান না। সত্যি কথা বলতে কী, বয়সকালে উনিও এদেরই মতো 'আধপাগল' ছিলেন। অন্তত লোকে তাই বলত। অ্যাডভেঞ্চার ক্লাবের মতো তিনিও বন্ধুবান্ধব নিয়ে একটা ক্লাব গড়েছিলেন। তার নাম ছিল 'ভবঘুরে সংঘ'। পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়ানোই ছিল তাঁদের লক্ষ্য।

মাস্টারমশাই বললেন, "এখানে? এখানে দেখার বলতে তো ওই ড্যাম! আর, পাহাড় ও জঙ্গল!'

"জঙ্গল আর আছে?" বাবা বললেন, "আসার সময় দেখলাম, মাথায় কাঠের পাহাড় নিয়ে জঙ্গল থেকে দলে-দলে মেয়ে-পুরুষ হাটে বিক্রি করতে যাচ্ছে। ফরেস্টের দু'-একটা গার্ডকে দেখলাম, তাদের দিকে উদাস চোখে চেয়ে, বসে-বসে খইনি ডলছে। পাশে শুয়ে আছে তাদের লাঠিগাছা। জঙ্গল কদ্দিন থাকবে মশাই?"

মাস্টারমশাই বললেন, "আসলে এখানকার লোকজন এত গরিব যে, জঙ্গল ছাড়া তাদের ঘরে হাঁড়িই চড়বে না। তাই ইচ্ছে করেই ফরেস্ট গার্ডরা চোখ বুজে থাকে। তবে, কেটেকুটেও যা পড়ে আছে, খুব খারাপ না। ইচ্ছে করলে তার ভিতরে এক চক্কর

দিয়ে আসতে পারেন।"

"না, না বাবা, জঙ্গলটঙ্গলে যেতে হবে না," মা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

ছোটকাকা মাস্টারমশাইকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনাদের এদিকে ফরেস্ট-ম্যালেরিয়ার কী খবর? জঙ্গলের দিকে তো লোকে এখন ম্যালেরিয়ার ভয়ে যেতেই চাইছে না।"

মাস্টারমশাই বললেন, "ম্যালেরিয়া নেই তা বলব না, তবে তুলনামূলকভাবে কম। তবে আপনাদের ভয় কী? আপনারা তো জঙ্গলে যাবেন দিনের বেলায়।"

"না, না। দিনেও গিয়ে কাজ নেই," মা জুড়লেন, "শুনছি, এখন জঙ্গলের ভিতর উলটোপালটা লোক ঢুকে গিয়েছে অনেক। গুলি খেয়ে মরব না কি?"

"না, না, ম্যাডাম। আমাদের এখানে এসব প্রবলেম নেই। আপনি আরামসে ঘুরতে পারেন।"

"মাথায় থাকুক আরাম। সাধ করে বাঘের পেটে কে যাবে?"

মাস্টারমশাই হেসে ফেললেন। বললেন, "বাঘ কোথায় পাচ্ছেন এখানে? আগে চিতাবাঘ ছিল, এখন তা-ও নেই। হুঁ, হায়না আছে কিছু-কিছু। তবে তারা মানুষ দেখলে আর ধারেকাছে ঘেঁষে না!"

"তা হলে আছেটা কী?" সৌমিতা যেন মুষড়ে পড়ল, "ফেরোসাস প্রাণী-ট্রানি কিচ্ছু নেই?"

উত্তরে মাস্টারমশাই সৃষ্টিছাড়া অ্যাডভেঞ্চার ক্লাবের ছেলেমেয়েদের হতাশ করে জানালেন যে, ফেরোসাস বলতে ভল্লুকটাই এক-আধ পিস রয়ে গিয়েছে এখনও। আর, হাতিঠাকুরকে যদি ফেরোসাস বলা হয়, তা হলে হাতিঠাকুরও। আজকাল তার উৎপাত খুব।"

"হাতি! হাতিঠাকুর! ফাইন ফাইন!" তাতান চেঁচিয়ে উঠল।

সৌমিতা হেসে ফেলল। এতক্ষণে বোধ হয় তাতান মাসটারমশাইকে একটু-একটু পছন্দ করতে শুরু করেছে। ওর এবারে ক্লাস এইট। মোটামুটি বড়ই হয়ে গিয়েছে। মাথায় রোজ একটু করে বাড়ছে। এই রেটে চালালে বাবা-কাকাকেও খুব শিগগির ছাড়িয়ে যাবে ও।

"দেখছ ছোটকা, তাতান কেমন তৈরি হয়ে গিয়েছে?" সৌমিতা হাসতে-হাসতে ছোটকাকাকে বলল, "এই জঙ্গলের মধ্যে বসেও হাতির কথা শুনে ভয় পেল না!"

কথাটা ঠিকই। আগে তাতান ভারী ভিতু ছিল। সব কিছুতেই তার ভয়। পাহাড়-জঙ্গলে বেরিয়ে যখন-তখন বিপদে পড়ে যেতে হত ওকে নিয়ে।

পপাই ঘাড় নেড়ে বলল, "হুঁ, এবার ওকে আমাদের সৃষ্টিছাড়া অ্যাডভেঞ্চার ক্লাবের পারমানেন্ট মেম্বার করে নাও ছোটকা।"

ক'দিন আগে টেস্ট পরীক্ষায় পাশ করে পপাই ক্লাবের মেম্বার হয়েছে। সৌমিতার চেয়ে সে সামান্য বড়। বি কম পড়ছে। এখনও পর্যন্ত যা পরিচয় পাওয়া গিয়েছে, সাংঘাতিক ডাকাবুকো ছেলে সে। সৌমিতাদের দেখাদেখি সে-ও ছোটকাকাকে 'ছোটকা' বলে ডাকে।

সৌমিতা ঘাড় দুলিয়ে পপাইয়ের কথায় সায় দিয়ে বলল, "হ্যাঁ। টেস্ট পরীক্ষায় ভাই এবার একটুর জন্য ফেল করে গিয়েছে।"

সৃষ্টিছাড়া ক্লাবের সদস্য যে-কেউ হতে পারে না। তার জন্য রীতিমতো টেস্ট পরীক্ষা দিতে হয়। টেস্টের জন্য যেসব টপিক ঠিক করা হয়, তা শুনেই অর্ধেক ছেলেমেয়ে ভয়ে পিছিয়ে যায়। প্রতিবার আউটিংয়ের আগে এই টেস্ট পরীক্ষা নেওয়া হয়।

এবারে টেস্ট দিয়েছিল পপাই, তাতান আর বাবলি। বাবলি তাতানের চেয়ে সামান্য ছোট। ফরসা, একমাথা চুল, বড়-বড় চোখ। সব সময় আনন্দে ছটফট করে বেড়াচ্ছে। সৌমিতার বাবলিকে ভারী পছন্দ। লালতটিতে তারও আসার কথা ছিল। কিন্তু ওর বাবা ছুটি না পাওয়ায় আসতে পারেননি।

টেস্ট পরীক্ষার জন্য ঠিক করা হয়, বেলুড় থেকে হিন্দমোটর স্টেশন পর্যন্ত হেঁটে যেতে হবে তাদের। শুধু হেঁটে যাওয়া নয়, পুরো পথ তাদের রেললাইন ধরে হাঁটতে হবে। গাড়িই আসুক, বা পুলিশেই ধরুক, লাইন ছেড়ে বাইরে যাওয়া যাবে না! গেলেই ডিসকোয়ালিফায়েড। বাবলি আধঘণ্টা যেতে না-যেতে আউট। তাতান অবশ্য লড়েছিল। কিন্তু উত্তরপাড়ার কাছাকাছি গিয়ে, ঘাড়ের উপর ট্রেনের ভোঁ শব্দ শুনে ভয় পেয়ে লাফ দিয়ে নীচে। ব্যস, আউট।

শেষ পর্যন্ত টিকে গেল পপাই। সামনে-পিছনে তাকিয়ে, ক্রমাগত লাইন বদলে-বদলে স্টার্ট করার দেড় ঘণ্টার মধ্যে হিন্দমোটর স্টেশনে পৌঁছে যায়। সেদিন জাজ হিসেবে ছোটকাকার সঙ্গে সৌমিতাও ছিল। পপাইরা হাঁটছিল লাইন ধরে, ওরা হাঁটছিল বাইরে-বাইরে।

পপাই ছাড়া আপাতত ক্লাবের পারমানেন্ট সদস্য হল সৌমিতা। ও অবশ্য প্রথম থেকেই সদস্য। ছোট থেকেই সৌমিতার ভয়ডর কম। মাথাটা অসম্ভব সাফ, কিন্তু একটু কল্পনাপ্রবণ। মাধ্যমিকে এইট্টি সিক্স পারসেন্ট নম্বর পেয়ে পাশ করে কিছুদিন হল আর্টস নিয়ে উচ্চ মাধ্যমিকে ভর্তি হয়েছে। বড় হয়ে ওর ইচ্ছে, এভারেস্ট পর্বতশৃঙ্গ জয় করে বাঙালি মেয়েদের দুর্নাম ঘোচাবে।

মাস্টারমশাই তাকিয়ে ছিলেন। ছোটকাকা কথা থামিয়ে ঘুরে গেলেন তাঁর দিকে। "মাস্টারমশাই, হাতি কি আজকাল খুব আসছে এদিকে?"

মাস্টারমশাই মাথা নেড়ে বললেন, "হুঁ, খুবই। জঙ্গল কেটে সাফ হয়ে যাচ্ছে! হাতি খাবেই বা কী? চরে বেড়াবেই বা কোথায়? তার উপর জঙ্গলের ভিতরেই যেখানে-সেখানে লোহা খাদান, পাথর খাদান বসে যাচ্ছে। ওই আওয়াজে হাতি টিকতে পারে!"

তাতান জিজ্ঞেস করল, "কাকু, তুমি নিজের চোখে হাতি দেখেছ?"

মাস্টারমশাই হেসে ফেললেন, "কেন দেখব না! পরশুই তো হাতি এসেছিল!"

"এখানে?" পপাইয়ের কথা আটকে এল।

"হুঁ। মাঝরাতের দিকে। আমরা অবশ্য আর বেরোইনি। দরজায় খিল এঁটে বসে ছিলাম।"

"কী করে বুঝলেন হাতি?" মা ঘর গোছানোর কাজ রেখে বসেই পড়লেন বাবার পাশে।

"কুকুরগুলো খুব ডাকছিল। বাইরে গাছের ডাল ভাঙার আওয়াজ পাচ্ছিলাম। পরের দিন উঠে খবর পেলাম, পাহাড়গোড়ার ধানখেতগুলো পুরো সাফ। হাতির পাল

এসেছিল।”

“ইস, আমি যদি থাকতাম!” সৌমিতা আপশোস করল।

সঙ্গে-সঙ্গে চোখ বড় হয়ে গেল মায়ের। সৌমিতাকে বললেন, “থাক, তোমায় আর পাকামো করতে হবে না! আমি যদি থাকতাম! বেশি-বেশি!”

বলতে-বলতে মা উঠে পড়লেন চেয়ার থেকে। ছোটকাকার দিকে ফিরে বললেন, “রজত, খবরদার ছেলেমেয়েদের নিয়ে একদম বাইরে বেরোবে না! তোমরা আমাদের এ কোন জায়গায় নিয়ে এলে!”

মায়ের টেনশন দেখে বাবাও হেসে ফেললেন। হাসতে-হাসতেই মজা করে মাস্টারমশাইকে বললেন, “তা হলে তো ভারী মুশকিল হল মাস্টারমশাই। হাতি তাড়ানোর বোমা-পটকাও তো সঙ্গে করে কিছু আনিনি।”

সৌমিতা বলল, “ওসব বোমা-পটকা দিয়ে হাতিকে আজকাল বোকা বানানো যাচ্ছে না বাবা। হাতিরা এখন চালাক হয়ে গিয়েছে।”

“উহুঁ, উহুঁ, হাতি এমনিতেই কিন্তু চালাক প্রাণী,” মাস্টারমশাই জোরে-জোরে মাথা নাড়িয়ে বললেন, “তোমরা ভাবো হাতি বোকা, তা কিন্তু নয়। হাতি বুদ্ধিমান তো বটেই, ধূর্তামিতেও কম যায় না! হাতির অসুবিধে একটাই।”

“বডি ওয়েট,” পপাই তাড়াতাড়ি জ্ঞান ফলানোর চেষ্টা করল, “তার জন্য নড়তে-চড়তে বা ছুটতে পারে না। ক্ষিপ্রতা কম।”

“এটাও ভুল ধারণা। হাতি প্রচণ্ড জোরে ছুটতে পারে। হাতির সঙ্গে রেসে তুমি পারবে না।”

“তা হলে?” মায়ের গলা থেকে যেন আর্তনাদ বেরিয়ে এল।

“তা হলে উপায় আছে। হাতি তাড়া করলে কখনও সোজা ছুটবেন না, এঁকেবেঁকে ছুটবেন। ডান দিক, বাঁ দিক ঘনঘন টার্ন নেবেন। আর, যদি সম্ভব হয়, স্লোপিংয়ে অর্থাৎ ঢালের দিকে নেমে যাবেন। হাতি উপরে উঠতে যতটা এক্সপার্ট, নামার ব্যাপারে নয়। বিশাল চেহারা নিয়ে হাতি আপনার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবে না।”

মা চেয়ে রইলেন। বাবা ঠেলা দিলেন তাঁকে, “বুঝলে? নাও, এখন থেকে দৌড়নো প্র্যাকটিস করতে শুরু করে দাও।”

“এই চেহারায়! রক্ষে করো!” মা উঠে পড়লেন।

ছোটকাকা মাস্টারমশাইকে মনে করিয়ে দিলেন, “হাতির সমস্যার কথাটা কী বলছিলেন?”

“হুঁ,” মাস্টারমশাই বললেন, “হাতির সমস্যা হল তার চোখ। তার চোখের গঠন এমনই যে, সব কিছু সে অ্যাকচুয়াল সাইজের চেয়ে কয়েক গুণ বড় দ্যাখে। এই সমস্যাটা হাতির আছে বলে, নিজের আকার সম্পর্কে তার সঠিক ধারণা নেই।”

“ভাগ্যিস নেই!” বাবা বিড়বিড় করে উঠলেন, “তা হলে আপনার হাতিঠাকুর সৃষ্টি রসাতলে পাঠিয়ে দিত। কাউকেই আর আস্ত রাখত না।”

“ঠিক বলেছেন। সত্যি-মিথ্যে জানি না, কথাটা আমি শুনেছিলাম আমার বাবার কাছ থেকে। আমার বাবা এই অঞ্চলের বড় শিকারি ছিলেন এককালে। জন্তু-জানোয়ার, জঙ্গল সম্পর্কে রীতিমতো অথরিটি ছিলেন।”

“ভেরি ইন্টারেস্টিং!” বাবা নড়েচড়ে বসলেন, “বাঘটাঘ মেরেছিলেন না কি?”

মাস্টারমশাই ঘাড় নেড়ে বললেন, “বাঘ নয়, চিতা। তবে গুটিকয়েক। হরিণ, খরগোশ, ময়ূরটয়ুর, বনমোরগই প্রধানত মারতেন। শিকারকে শিকার, খাওয়াকে খাওয়া। বাবা জঙ্গলের একদম ভিতরের দিকে একটা আস্তানা করে রেখেছিলেন। মস্ত এক ঝিলের ধারে। সন্ধের পর চাঁদিনি রাতে সেখানে গিয়ে বসে পড়তেন রাইফেল নিয়ে।”

সৌমিতা জিজ্ঞেস করল, “ওই ঝিলে জঙ্গলের প্রাণীরা জল খেতে আসত বুঝি?”

“ঠিক বলেছ।”

পপাই সাগ্রহে বলল, “সেই ঘরটা আছে এখনও?”

“আছে, তবে ভেঙে পড়েছে।”

পপাই চেঁচিয়ে উঠল, “আমাদের ওখানে নিয়ে যাবেন মাস্টারমশাই?”

“হ্যাঁ, হ্যাঁ। যাবেন নিয়ে?” সৌমিতা গলা মেলাল।

“না, না!” মা চেঁচামিচি জুড়লেন, “বলছি না, তোদের জঙ্গলেটঙ্গলে গিয়ে কাজ নেই। শুনলি তো, হাতিঠাকুর বেরিয়েছে!”

“মা হাতিকে হাতিঠাকুর বলছে,” তাতান হেসে ফেলল।

“চুপ কর,” মা গলা ছাড়লেন।

মাস্টারমশাই বাবার দিকে ফিরে অন্য কথা পাড়লেন, “আপনারা কদ্দিন আছেন?”

বাবা উত্তর দিলেন, “দিন পাঁচেকের প্ল্যান করে এসেছিলাম। কিন্তু আপনি আবার হাতিঠাকুরের ভয় ধরিয়ে দিলেন।”

মাস্টারমশাই বললেন, “না, না, দিনের বেলায় ভয় নেই। ড্যামের লোকজন আছে, ফরেস্টের সিকিউরিটি গার্ড আছে, জঙ্গলটা শুধু বাদ দিয়ে ইচ্ছেমতো ঘুরুন না যেখানে খুশি। তবে সন্ধে নামলে খবরদার বাইরে বেরোবেন না। ঘরের দরজা-জানলা এঁটে রাখবেন ভাল করে। আপনাদের বাংলোর ভিতর গাছপালা তো অনেক, কাঁটাতারের বেড়া উপড়ে বেশ কয়েকবার হাতির পাল ঢুকে পড়েছিল।”

“লাভলি!” সৌমিতার চোখ চকচক করে উঠল। ছোটকাকার দিকে চেয়ে উত্তেজিত গলায় বলল, “আমাদের অ্যাডভেঞ্চার এবার দারুণ জমে যাবে মনে হচ্ছে। তোমার সিলেকশনের সত্যি জবাব নেই ছোটকা। থ্যাঙ্ক ইউ।”

ভয়ে মুখ শুকিয়ে এল মায়ের, “কী করবি তোরা?”

বাবা ঠাট্টা করে বললেন, “টিপ প্র্যাকটিস করবে। রাতে বাংলোর ছাদের উপর থেকে হাতির গায়ে পাথর ছুড়বে।”

মা চেঁচিয়ে উঠলেন, “একদম না মিতা! এরকম করলে কিন্তু এখনই বাড়ি ফিরে যাব।”

সকলে হেসে উঠলেন। শুধু সৌমিতা হাসছিল না। বলল, “শুধু বাবলিটা যদি আসত আমাদের সঙ্গে! কী মিষ্টি মেয়েটা।”

“হুঁ,” তাতান মাথা নেড়ে বলল, “দারুণ মজা হত তা হলে।”

টেস্ট পরীক্ষায় ফেল করলে কী হবে, বাবলি তাদের সঙ্গে আসার জন্য দু' পা বাড়িয়েই ছিল। কিন্তু যা ছটফটে মেয়ে, তার বাবা তাকে একা ছাড়তে কিছুতেই রাজি হলেন না। কাল যখন তারা আসছিল, তখন কী কান্না তার!

মাস্টারমশাই উঠে পড়লেন। ঠিক তখনই একটা ঘটনা ঘটল। বাইরে থেকে দৌড়তে-দৌড়তে এসে পড়ল বাংলোর চৌকিদার মনভোলা মাঝি। প্রচণ্ড উত্তেজিত লাগছিল তাকে। বুকটা

উঠছিল-পড়ছিল তার। বোঝা গেল কিছু একটা ঘটনা ঘটেছে। বাবলির কথা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলল সৌমিতা।

॥ ২ ॥

মনভোলা মাঝির নামটা যত সুন্দর, চেহারা ততটা নয়। বেঁটে, কালো, কিছুটা কুঁজোও। তবে তার গোঁফজোড়া জবরদস্ত। ঠোঁটের কর্নার থেকে শার্প বাঁক নিয়ে নেমে গিয়েছে স্ট্রেট। ও এই বাংলোর একধারে থাকে। খানিক আগে বাবার কাছ থেকে টাকা নিয়ে বাজারে গিয়েছিল। সেখান থেকেই আসছে।

"কী ব্যাপার মনভোলা? কী হয়েছে?" মাস্টারমশাই জিজ্ঞেস করলেন।

উত্তরে সে যা বলল, সকলে নড়েচড়ে উঠল। একেই কি টেলিপ্যাথি বলে? ড্যামের দিকে হাতি বেরিয়েছে। মনভোলা বাজার সেরে সেখান থেকেই ফিরছিল। ড্যামের তলা দিয়েই বাজারের রাস্তা। পথে লোকজন পালাচ্ছে দেখে সে-ও পালিয়ে এসেছে।

"চলো তো দেখি," মাস্টারমশাই এগোলেন।

ছোটকাকা চললেন তাঁর সঙ্গে, দলবল নিয়ে।

"অ্যাই, কোথায় যাচ্ছিস তোরা? কোথায়?" মা চিৎকার জুড়লেন, "ওরে যাস না, যাস না। ও রজত, অ্যাই মিতা, তাতান রে, তাতান!"

বাবা মাকে থামিয়ে দিলেন, "যাচ্ছে, যেতে দাও না। ওদের সঙ্গে তুমি পারবে?"

ছোটকাকা ঘুরে মাকে আশ্বস্ত করলেন, "বউদি, দাদাকে নিয়ে তুমি দরজাটা দিয়ে দাও। আমরা এখনই আসছি।"

মাস্টারমশাইয়ের পিছনে ছুটতে-ছুটতে মিনিট পাঁচেকের মধ্যে ড্যামে পৌঁছে গেল সৌমিতারা। সন্ধে হয়ে এসেছে। তবে এখনও কিছুটা আলো আছে আকাশে। ড্যামে ওঠার মুখে ছোট একটা ঝুপড়ি। সেখানে গ্রামের ক'জন লোক দাঁড়িয়ে উঁকি মেরে দেখার চেষ্টা করছিল ড্যামের দিকটায়। কিছু দূরে একটা টুরিস্ট বাস লোকবোঝাই হয়ে ঘড়ঘড় করছে। দেখেই বোঝা যায়, বাইরের পার্টি। ড্যামে পিকনিক করতে এসেছে। হাতির ভয়ে তড়িঘড়ি পালাচ্ছে।

গ্রামের লোকজন এদের দেখে সাহস পেয়ে এগিয়ে এল। সকলে মিলে উঠে পড়ল ড্যামের উপর। ড্যামের উপরের রাস্তাটা একেবারে ফাঁকা, একটাও লোক নেই। বিশাল জলাধার, উঁচু-উঁচু পাহাড়। ঢেউয়ের মতো ছড়ানো-ছিটানো জঙ্গল থমথম করছে।

"ওই যে! ওই যে ছোটকা!" পপাই হঠাৎ হাত তুলে জঙ্গলের একদিক দেখিয়ে দিল।

সকলে তাকাল। অনেকটা দূর, তার উপর আলো পড়ে এসেছে। হাতি চোখে না পড়লেও বেশ বোঝা যায়, জঙ্গল নড়ছে। এখান থেকে কম করে আধ কিলোমিটার রাস্তা, তা-ও সোজা পথ নয়, ড্যামের ও-প্রান্তের রাস্তা ধরে আসতে হয়। পিকনিক পার্টি ভয়ে পালাল। সৌমিতা হাসি চেপে ড্যামের রাস্তা ধরে খানিকটা এগিয়েই থেমে গেল। গলা চড়িয়ে ডাকল, "ছোটকা, দেখবে এসো!"

ছোটকাকা এগিয়ে এলেন। পিছনে তাতান আর পপাই। সৌমিতা রাস্তার দিকে তাকিয়ে ওড়নায় মুখ চেপে হাসছে। তার দেখাদেখি সকলে রাস্তার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল। জুতো। রাশিরাশি জুতো। চটি-চপ্পলই বেশি। শু, ক্যাম্বিসের জুতোও আছে কয়েকটা। রাস্তার অনেকটা জুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। হাতি দেখে নার্ভাস হয়ে পালাতে গিয়ে পা থেকে খুলে পড়ে গিয়েছে পিকনিক পার্টির। একেই বলে প্রাণের মায়া!

তাতান শব্দ করে হাসতে শুরু করল। তার সঙ্গে গলা মেলাল পপাই। হাসতে-হাসতে বলল, "পিকনিক পার্টির লোকগুলো ডরপুক নাম্বার ওয়ান। সাহসের স্টক বাড়ানোর জন্য ওদের ইমিডিয়েট আমাদের মতো একটা অ্যাডভেঞ্চার ক্লাব খোলা উচিত।"

ছোটকাকা ভুরু তুললেন, "পাকা-পাকা কথা বলিস না পপাই। তোরা কি নিজেদের খুব সাহসী ভাবিস?"

মাস্টারমশাই হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন, "এবার দেখুন। দেখুন, দেখুন! হাতিঠাকুর বেরিয়েছেন।"

ওরা মুখ তুলে দূরে জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। অন্ধকার ভালই নেমে গিয়েছে, তবু হাতিঠাকুরকে দেখতে অসুবিধে হল না। দাঁতাল হাতি। ন' থেকে দশ ফুট উঁচু হবে। সাংঘাতিক রোখ। শুঁড়ে আস্ত একটা গাছ পেঁচিয়ে বিষম আক্রোশে সেটাকে মাটিতে আছড়াচ্ছে।

মাস্টারমশাই ফিসফিস করে উঠলেন, "দলছুট হাতি। ভীষণ ফেরোসাস হয় এগুলো। মনে হচ্ছে, পাহাড় থেকে যে দলটা নেমেছিল তার থেকেই ছিটকে বেরিয়েছে এটা। নাঃ, চিন্তা ধরে গেল দেখছি। এসব হাতিকে কিচ্ছু বিশ্বাস নেই।"

কেউ কোনও কথা বলল না। তাতানের মুখের হাসি শুকিয়ে আসছিল। ছোটকাকার প্যান্ট ধরে টান দিয়ে বলল, "চলো ছোটকা, এবার ফিরে যাই।"

ছোটকাকা বিরক্ত হলেন। বললেন, "ব্যস, তোর সাহসের স্টক শেষ? তোকে দিয়ে হবে না।"

পপাই মন দিয়ে হাতি দেখছিল। হঠাৎ সে বিড়বিড় করে উঠল, "ছোটকা, চলো না, আর একটু সামনে থেকে হাতিটাকে দেখে আসি।"

সঙ্গে-সঙ্গে সৌমিতাও নেচে উঠল, "হ্যাঁ, চলো না ছোটকা। চলো চলো।"

তাতান গোলমাল করে উঠল, "না, না, ছোটকা! ফিরে চলো। মা ওদিকে ভাবছেন।"

ছোটকাকা এবার রেগে আগুন হয়ে গেলেন। গলা তুলে বললেন তাতানকে, "ক্লাবে পারমানেন্ট হতে তোর এখনও বহুত দেরি তাতান। মেম্বাররা চাইছে হাতি দেখতে যাবে, সেটাই ফাইনাল। তোর ভয় লাগলে ফিরে যা। মাস্টারমশাই তোকে ছেড়ে দিয়ে আসবেন।"

মাস্টারমশাইয়ের ভুরু কুঁচকে উঠল, "আপনারা সত্যি-সত্যি হাতি দেখতে যাবেন না কি?"

ছোটকাকা মৃদু হেসে বললেন, "সেই রকমই ইচ্ছে আমার ছেলেমেয়েদের। আপনিও চলুন না আমাদের সঙ্গে।"

ভদ্রলোক আকাশ থেকে পড়লেন, "এখন?"

ছোটকাকার হয়ে জবাব দিল পপাই, "সেটাই তো মজা। অন্ধকারের মধ্যে জঙ্গলে হাতি দেখতে যাওয়া! গ্রেট!"

ততক্ষণে অন্ধকার ঘন হয়ে উঠেছে। হাতিঠাকুরও মিলিয়ে

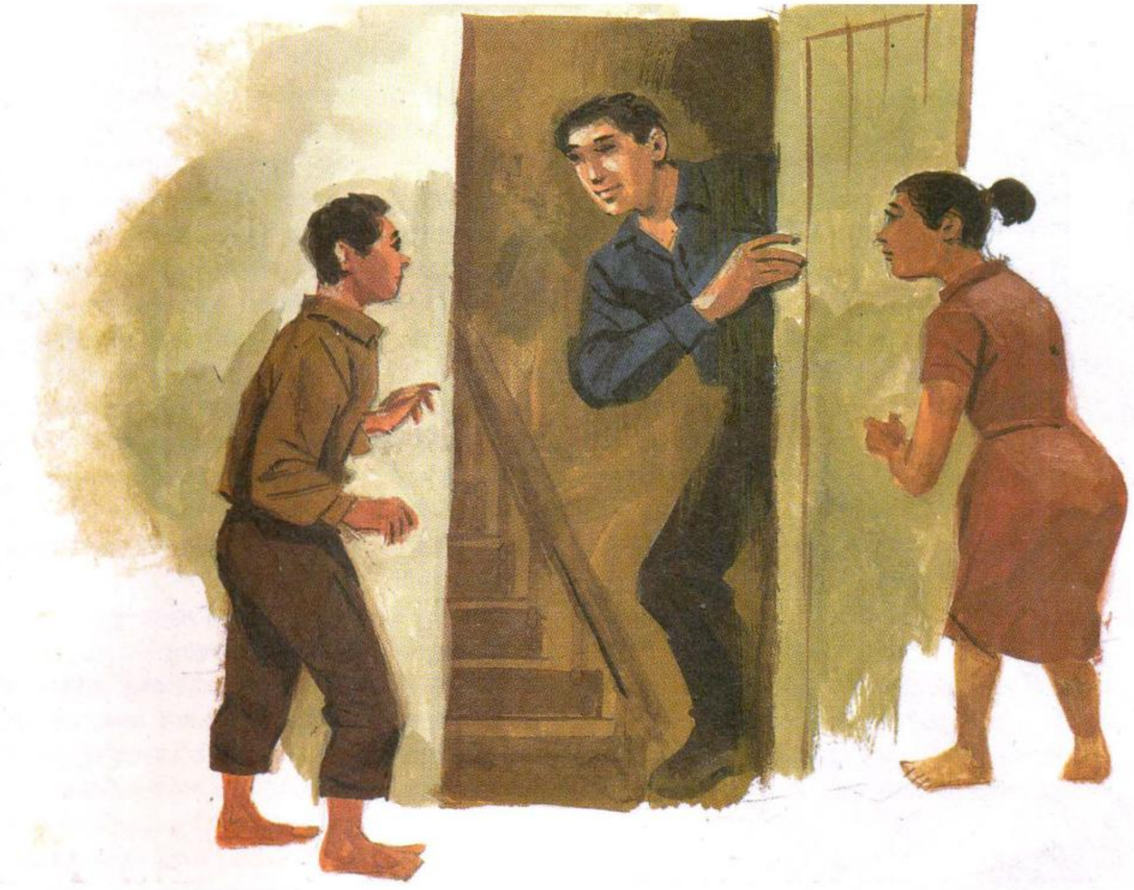

গেছে। গ্রামের লোকজন যারা এসেছিল, তারাও একে-একে ফিরে যাচ্ছে। ঘরে গিয়ে সকলে এমন শক্ত করে দরজা-জানলা আঁটবে, সকালের আগে আর খুলবে না। অসন্তোষে মাথা নাড়াল সৌমিতা। এত সুন্দর আর এত বড় ড্যামটা জনশূন্য হয়ে পড়ে থাকবে সমস্ত রাত? শুধু হাতির ভয়ে!

"ছোটকা, এখন না গিয়ে মাঝরাতে জঙ্গলে ঢুকলে হয় না?" সৌমিতার মাথায় অন্য প্ল্যান খেলে গেল।

"মাঝরাতে?" ছোটকাকা একটু চিন্তা করে বললেন, "মন্দ আইডিয়া নয়। আমাদের অ্যাডভেঞ্চারের ভাল আইটেম। পপাই, কী বলিস?"

পপাই একটু যেন হতাশ হল, "এখন তা হলে কী হবে?"

ছোটকাকা বললেন, "এখন আপাতত বাংলোয় ফেরত। তারপর রাতে খাওয়াদাওয়া করে প্রিপারেশন নিয়ে একেবারে বেরনো যাবে।"

তাতান যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই ভাল।"

"হওয়াচ্ছি তোর ভাল!" ছোটকাকা ঘুরে গেলেন তার দিকে, "ডরপুক নাম্বার ওয়ান। রাতে যেতে না চাইলে বিছানা থেকে তুলে নিয়ে যাব তোকে।"

তাতান চুপ করে গেল। সকলে আবার বাংলোর পথ ধরলেন। মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে টর্চ ছিল। সেটা উনি জ্বালাতে গিয়েও জ্বালালেন না। চাপা গলায় বললেন, "সাবধানে দেখেশুনে আসবেন। হাতিটা যে-কোনও মুহূর্তে এসে পড়তে পারে।"

অন্ধকারে কেউ কারও মুখ দেখতে পাচ্ছে না। গাছে-গাছে পাখিরা ডাকছে। ঝোপেঝাড়ে কান ফাটিয়ে ঝিঁঝি ডাকছে সমানে। ক'দিন আগে পুজো গিয়েছে। এর মধ্যে বাতাসে বেশ শিরশিরে ভাব।

আস্তে-আস্তে ড্যামের জলের ছলাৎ-ছলাৎ শব্দ দূরে চলে গেল। ওরা সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল বংলোর পথে। একপাশে ক্যানেল চলে গিয়েছে। অন্য পাশে সারিসারি গাছপালা, বাঁশবন। রাস্তায় লোকজনের চিহ্নমাত্র নেই। এসব জায়গার পাশে কলকাতার কথা এখন ভাবাই যায় না। কে বলবে, সেখানে এখন রাস্তায়-রাস্তায় গিজগিজ করছে লোক, ঘরে-ঘরে টিভি চলছে, সিনেমা হলে বসে হাজার-হাজার মানুষ নির্বিবাদে ছবি দেখছে!

বাংলোর কাছাকাছি আসতেই সৌমিতার নজরে পড়ল, আলোয় ঝলমল করছে বাংলো। চারপাশের নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের মধ্যে বাংলোটাকে ঠিক যেন আলোভরা জাহাজের মতো লাগছে। আলো চলে গেলেও বাংলোয় জেনারেটরের ব্যবস্থা আছে। সরকারি লোকজন বা বড়মাপের টুরিস্ট এলে চালানো হয়। পপাইয়ের বাবার কল্যাণে তারা এখন রীতিমতো ভি আই পি।

"আপনারা যান তা হলে," মাস্টারমশাই ছোটকাকাকে বললেন।

"আপনার বাড়ি কদ্দুর?" ছোটকাকা জানতে চাইলেন।

জানা গেল, বাংলোর গা দিয়ে পায়েচলা সরু পথ ধরে মিনিট দুই গিয়ে ক্যানেল পেরোলেই মাস্টারমশাইয়ের বাড়ি। ক্যানেলের ও-দিকটা একেবারে নির্জন। ঘরদোর বিশেষ নেই। তাঁর বাড়ির পরেই বিশাল খেত। খেত যেখানে শেষ, সেখানেই বনের শুরু। বন চলে গিয়েছে একেবারে পাহাড়ের তলা পর্যন্ত। ক'দিন আগে হাতি ওই পথেই নেমে এসে খেত লন্ডভন্ড করে, ক্যানেল পেরিয়ে গ্রামে ঢুকে আসে।

যাওয়ার আগে মাস্টারমশাই এগিয়ে এলেন ছোটকাকার দিকে।

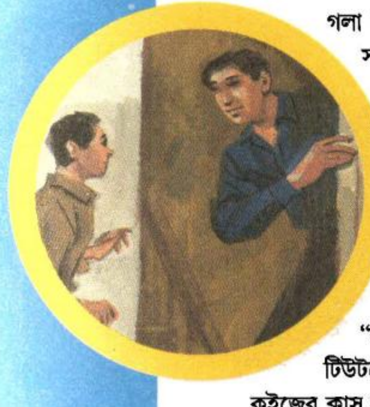

গলা নামিয়ে জানতে চাইলেন, "আপনারা সত্যি-সত্যি রাতে বেরোবেন?"

ছোটকাকা হাল্‌কা চালে বললেন, "কেন, আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না?"

ভদ্রলোক বিব্রত হয়ে পড়লেন, "না, না, তা নয়। শহর থেকে আরও তো ছেলেপুলে আসে, কই তাদের মধ্যে এরকম খেয়াল তো কখনও দেখিনি!"

ছোটকাকা মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বললেন, "কী করে দেখবেন? স্কুলের পড়া, প্রাইভেট টিউটরের পড়া, সঙ্গে সাঁতার, যোগব্যায়াম, আঁকা, কুইজের ক্লাস সামলে ছেলেপুলেদের আর সময় কোথায়, যে অ্যাডভেঞ্চারে বেরোবে? এখনকার ছেলেমেয়েদের কাছে কেরিয়ার গড়াই একমাত্র অ্যাডভেঞ্চার। তার জন্যই ছোট থেকে সব জানপ্রাণ লড়িয়ে দিচ্ছে। ট্র্যাজেডি!"

শিক্ষক হয়েও মাস্টারমশাই এই সব গুরুগম্ভীর আলোচনায় বিন্দুমাত্র উৎসাহ দেখালেন না। দায়সারাভাবে "তা তো বটেই, তা তো বটেই" বলে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। গ্রামের আর পাঁচজন লোকের চেয়ে ভদ্রলোককে সাহসীই বলতে হবে। মাঠের মধ্যে একা থাকেন। হাতি বেরিয়েছে শুনেও একা-একা চলে গেলেন।

পপাই বলল, "মাস্টারমশাই হঠাৎ কেমন ফিউজ হয়ে গেলেন না?"

সৌমিতা ঘাড় দুলিয়ে সায় দিয়ে বলল, "হুঁ, চিন্তায় পড়ে গিয়েছেন। আমাদের মতো পাগল তো আগে কখনও দেখেননি।"

সৌমিতার কথা শেষ হল না, হঠাৎ বাংলোর গেটটা সামান্য ফাঁক হয়ে গেল। জোরালো টর্চের আলো এসে পড়ল সকলের মুখে। সেই সঙ্গে গম্ভীর প্রশ্ন একটা, "আপনারা কি সেনগুপ্তসাবের মেহমান?"

"সেনগুপ্ত!" সৌমিতা তাকাল ছোটকাকার দিকে। ছোটকাকা সৌমিতার দিকে।

"হ্যাঁ। আমার বাবাই সেনগুপ্তসাব।" পপাই এগিয়ে গেল সামনে, "বাত কেয়া হ্যায়?"

গেট হাট হয়ে গেল। প্যান্ট-শার্ট পরা ফুটবলারদের মতো ছোট-ছোট চুল কাটা এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন। তাদের খুঁটিয়ে দেখতে-দেখতে হিন্দিঘেঁষা বাংলায় বললেন, "আপনারা জলদি ভিতরে আসুন। আপনাদের খুঁজতেই আমরা বেরোচ্ছিলাম। আমাদের সাহেব ভীষণ চিন্তায় পড়ে গিয়েছেন।"

ভিতরে ঢুকতেই সৌমিতার নজরে পড়ল, বাংলোর হাতায় একটা জিপ দাঁড়িয়ে আছে। জিপের পাশে উর্দিটুপিপরা জনাচারেক লোক। এরা হয় পুলিশের, নয় ফরেস্টের রক্ষী।

ভদ্রলোক ছোটকাকাকে বুকে হাত জোড় করে 'নমস্তে' জানিয়ে নিজের পরিচয় দিলেন, "আমার নাম লছমিকান্ত শর্মা। আমি এই এলাকার ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসার। খুবই চিন্তায় ফেলে দিয়েছিলেন আপনারা।"

"এসেছিস?"

সৌমিতাদের সাড়া পেয়ে বাংলো থেকে বেরিয়ে এলেন সৌমিতার মা আর বাবা। তাঁদের পিছনে শার্ট-প্যান্ট পরা লম্বা ও স্বাস্থ্যবান এক ভদ্রলোক। চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা। সরু থেকে মোটা হয়ে যাওয়া পরিচ্ছন্ন গোঁফজোড়া।

জানা গেল, ইনিই রেঞ্জ অফিসারসাহেব, খোদ জেলার ফরেস্ট অফিসার। ভদ্রলোকের নামটি ভারী অদ্ভুত। সুসময়, সুসময় নন্দী। রাইটার্স থেকে নির্দেশ মোতাবেক সুসময়বাবু সেনগুপ্তসাহেবের লোকজনের খোঁজখবর করতে এসেছেন। ছোটকাকাকে তিনি রীতিমতো বকাবকি জুড়ে দিলেন। বাচ্চাদের নিয়ে এইভাবে বাইরে-বাইরে ঘোরা একেবারে উচিত হয়নি তাঁর। সুসময়বাবুর সঙ্গে যোগ দিলেন লছমিকান্ত এবং অবশ্যই সৌমিতার মা। তবে বাবা কিছুই বলছিলেন না, শুধু মুচকি-মুচকি হাসছিলেন।

ঘরে ঢুকেও মা রেহাই দিলেন না ছোটকাকাকে। সমানে বকাবকি করে চললেন। সৌমিতা আর থাকতে পারল না। বলে উঠল, "শুধু ছোটকাকে বকছ কেন? ছোটকার কী দোষ? আমরা তো নিজের ইচ্ছেতেই গিয়েছি।"

"তুই চুপ কর!" মা আরও রেগে গেলেন, "নিজের ইচ্ছেতেই গিয়েছি। ভারী বীরপুরুষ সব!"

তাতান ফিক করে হেসে ফেলল, "মা দিদিকে পুরুষ বলল।"

বাবা মন্তব্য করলেন, "ওটা বীরাঙ্গনা হবে।"

"দয়া করে তুমি এর মধ্যে থেকো না," এবার ছোটকাকাকে ছেড়ে মা বাবাকে নিয়ে পড়লেন, "তোমার জন্যই এরা এত আশকারা পেয়ে গিয়েছে। হাতি-হাতি করে সব ছুটল, তুমি গা ছেড়ে দিয়ে বসে রইলে! একটা বিপদআপদ হলে কী হত?"

সুসময়বাবু বললেন, "আপনাদের কী হত জানি না, তবে সকলের আগে আমার চাকরিটি যেত। বনমন্ত্রী আপনাদের চেনা লোক, আমাকে উনি ছেড়ে দিতেন?"

ছোটকাকা বললেন, "তা হলে তো খুবই অন্যায় হয়ে গিয়েছে দেখছি।"

"তা একটু হয়েছে," সুসময়বাবু সামান্য যেন নরম হলেন। বললেন, "শুধু হাতি তো নয়, এসব জায়গা খারাপ হয়ে গিয়েছে। কাগজপত্রে পড়েন তো, কী বলব আপনাদের। এই তো, রিসেন্টলি জঙ্গল থেকে একটা বডি রিকভার করলাম আমরা। এখানকারই গ্রামের লোক। বেআইনি অস্ত্র কেনাবেচার সঙ্গে যুক্ত ছিল।"

"অ্যাঁ!" মা চেঁচিয়ে উঠলেন।

"জঙ্গল আর আগের মতো সেফ নয়। দয়া করে আর যাই করুন, জঙ্গলে ঢুকবেন না। গুলি খেয়ে মরবেন। পাশের রাজ্য থেকে তাড়া খেয়ে একজন নটোরিয়াস ডাকাত তার দুই চেলাকে নিয়ে এদিকে এসে ঢুকেছে। আমাদের কাছে যা খবর, অস্ত্র কেনাবেচার নাটের গুরু সে-ই। মধ্যে-মধ্যে লরি লাগিয়ে বনের ভিতর থেকে গাছপালাও কেটে নিয়ে পালাচ্ছে লোকটা।"

সুসময়বাবু ঘুরে গেলেন লছমিকান্তর দিকে, "বলুন না!"

লছমিকান্ত "হাঁ হাঁ" বলে জুড়লেন, "বদমাশটা তার চেলাদের নিয়ে মাঝে-মাঝে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে, মোটরবাইকে চেপে লালতটিতেও হামলা করছে। ছোটখাটো চুরি-ছিনতাই, মস্তানি-গুন্ডামি, লোকজনের উপর টুকটাক ঝামেলা চালাচ্ছে। জঙ্গলে ফোর্স নিয়ে কয়েকবার করে রেড করেও আমরা নরেশের ঠেকটা কোথায়, খুঁজে বের করতে পারিনি।"

"লোকটার নাম নরেশ?" ছোটকাকা জানতে চাইলেন।

"হুঁ। নরেশ সিংহ।"

"কাকু, আমরা তা হলে কী করব?" এতক্ষণে মুখ খুলল

পপাই। দৃষ্টি স্থির সুসময়বাবুর দিকে, "আমরা তো জঙ্গল দেখতেই এসেছি।"

সুসময়বাবু বললেন, "আমাদের কিচ্ছু করার নেই বাবা। উপর থেকে অর্ডার আছে, সিকিউরিটি ফার্স্ট।"

সৌমিতা দমে গেল। মাথা নাড়াতে-নাড়াতে বাবাকে লক্ষ করে বলল, "বাবা, তা হলে কালই চলো ফিরে যাই এখান থেকে।"

তাতানও সায় দিল, "হ্যাঁ, তাই চলো।"

পপাই তেতে উঠল, "ফিরে যাব মানে? আমি যাচ্ছি না। জঙ্গল দেখতে এসেছি, জঙ্গল দেখেই যাব।"

সুসময়বাবু অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন। তাড়াতাড়ি হাত নেড়ে বললেন, "ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমি তোমাদের জঙ্গল দেখানোর ব্যবস্থা করব। কবে যাবে? কাল? পরশু? আমি নিজে সিকিউরিটি নিয়ে তোমাদের জঙ্গল দেখিয়ে দেব।"

সৌমিতার হাসি পেল। এই ভাবে জঙ্গল দেখা আর চিড়িয়াখানায় গিয়ে বাঘ দেখা একই কথা। পপাইয়ের বাবাকে কে মাথার দিব্যি দিয়েছিল অত বড় অফিসার হতে?

সুসময়বাবুরা লোকলশকর নিয়ে চলে গেলেন। পপাই তখনও গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সৌমিতা এগিয়ে গেল। ফিসফিস করে তার কানে-কানে বলল, "পপাই, ঘাবড়াস না, তোর জঙ্গল আজই হবে। আজ রাতেই। তুই রেডি তো?"

পপাই লাফিয়ে উঠল। চেঁচিয়ে বলল, "হান্ড্রেড পারসেন্ট!"

॥ ৩ ॥

সেদিন রাতে খাওয়াদাওয়ার পর মনভোলা বাইরের সব আলো নিভিয়ে দিল। সকলে মিলে উঠে এল বাংলোর ছাদে। আগাগোড়া মোজাইক করা চমৎকার ছাদখানা। বিশাল-বিশাল দু'খানা জলের ট্যাঙ্ক। ছাদের পাঁচিলের উপর ঝুঁকে পড়ে গলাটা বাড়িয়ে দিল সৌমিতা। চারপাশে শুধুই গাছ। ড্যামের দিকে হাল্কা আলোর রেখা ছাড়া প্রাণের চিহ্ন নেই কোথাও। এখানকার লোকজন কি অন্ধকার হলেই আলোটালো নিভিয়ে শুয়ে পড়ে? নাকি হাতির ভয়েই আজকাল এরকম করছে?

আরও একটু ঝুঁকল সৌমিতা। তারস্বরে ঝিঁঝিঁপোকা ডাকছে। কত রকমের সুর, কত রকমের তান। তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে গাছপালা থেকে সশব্দে ঝরে পড়ছিল শুকনো পাতা। কিন্তু হাতি কেন, হাতির লেজের একটা কোনাও চোখে পড়ল না। সৌমিতা মাথা ঝাঁকাল। বড্ড পানসে হয়ে যাচ্ছে এবারের টুরটা।

ছোটকাকা তাতান আর পপাইকে নিয়ে মাদুর পেতে বসে গল্প করছিলেন। সৌমিতাকে ডাক দিলেন, "মিতা এদিকে আয়।"

সৌমিতা এসে বসল। নীচে বাংলোর হাতায় বাবা পায়চারি করছেন। রোজ রাতে খাওয়ার পর বাবা গুনে-গুনে ঠিক হাজার পা হাঁটেন। সেই সময় মা তাঁকে যথাসাধ্য সঙ্গ দিয়ে থাকেন। আজও দিচ্ছেন। খাওয়াটা বেশ গুরুতর হয়ে গিয়েছে। তার উপর নতুন জায়গা। বাবার আজ হাজার পা দেড়-দু' হাজারে দাঁড়িয়ে গেলেও আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। এটাই সুযোগ। যা আলোচনার এই ফাঁকে সেরে ফেলতে হবে।

ছোটকাকা জানতে চাইলেন, "আজ রাতের প্রোগ্রাম ঠিক আছে তো?"

পপাই আনন্দের চোটে হিন্দি বলে ফেলল, "বিলকুল!"

তাতান ভয় পাচ্ছিল। বলল, "জঙ্গলটা বাদ দিলে হয় না

শ্রী দেবাশীষ মৌলিক
সম্পাদিত
(by a Group of 20 paper setters)

মাধ্যমিকের সেরা
সহায়ক বই

মাধ্যমিক ইতিহাস সহায়িকা
Madhyamik English Sahayika
মাধ্যমিক বাংলা সহায়িকা
মাধ্যমিক গণিত সহায়িকা
মাধ্যমিক ভৌত-বিজ্ঞান সহায়িকা
মাধ্যমিক ভূগোল সহায়িকা
মাধ্যমিক জীবন-বিজ্ঞান সহায়িকা
মাধ্যমিকের ঐচ্ছিক জীববিদ্যা সহায়িকা
মাধ্যমিকের ঐচ্ছিক মৎস্যচাষ সহায়িকা
রায়-হালদার-সাঁতরা প্রণীত

গৃহশিক্ষকের সাহায্য ছাড়াই
মাধ্যমিক পরীক্ষায় লেটার মার্কস পেতে
হলে এই বইগুলির সাহায্য চাই-ই চাই

PRASA-02

প্রান্তিক
স্কুল বই-এর জগতে নতুন পথের দিশারী

১৮, ডাঃ কার্তিক বসু স্ট্রীট, কলকাতা - ৭০০ ০০৯
ফোন: ২৩৫০-৯৩৫১, ২৩৫২-৬৭১২,
টেলিফ্যাক্স: ২৩৫০-৯৩৫১

ছোটকা? সুসময়কাকু যা বলে গেলেন!"

ছোটকাকা ফস করে রেগে উঠলেন, "সেটা নিয়ে তো তোকে কেউ ভাবতে বলেনি? চুপচাপ থাক।"

তাতান চুপ করে গেল। ঠিক হল, এখন নীচে গিয়ে যে যার বিছানায় লক্ষ্মী ছেলে বা মেয়ের মতো শুয়ে পড়বে। শুলেও ঘুমনো কিন্তু চলবে না। মা-বাবার ঘুম গাঢ় হলে ঠিক রাত বারোটা নাগাদ যার-যার অ্যাডভেঞ্চার কিট কাঁধে ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়বে। সৃষ্টিছাড়া অ্যাডভেঞ্চার ক্লাবের একমাত্র পারমানেন্ট মেম্বাররাই এই কিট ব্যবহার করতে পারে। এতে দড়ি, ছুরি, টর্চ, জলের বোতল, ফাস্ট এড-এর সরঞ্জাম—মোটামুটি সব রকম প্রয়োজনীয় জিনিসই গুছিয়ে রাখা থাকে।

সৌমিতা জানতে চাইল, "বেরোবটা কোথা দিয়ে? মনভোলা তো মেনগেট কখন বন্ধ করে দিয়েছে।"

ছোটকাকা বললেন, "তার জন্য চিন্তা নেই। কাঁটাতারের বেড়ার ফাঁকগুলো মোটামুটি বড়ই আছে। হাতি না গলুক, একজন মানুষ ঠিক গলে যেতে পারবে।"

"আমায় ছেড়ে দাও ছোটকা," ভয়ে তাতানের গলা কাঁপতে শুরু করল, "কাকু বলল শুনলে না, যদি গুন্ডাগুলো গুলিটুলি করে?"

"করলে করবে। গুলি খাবি। তবু যেতে হবে," ছোটকাকার গলার স্বর কঠিন হয়ে এল।

তাতান ছোটকাকার ভয়ে জড়সড় হয়ে গেল। আহা রে। সৌমিতার মন নরম হয়ে এল। তাতানের কাঁধে হাত রেখে বলল, "তুই এত ভয় পাচ্ছিস কেন ভাই? শোন, সুসময়কাকু আমার মনে হচ্ছে একটু বাড়িয়েই বলেছেন। অবস্থা মোটেই অতটা খারাপ নয়। তা হলে মাস্টারমশাই নিশ্চয়ই বলতেন। তিনি তো লোকাল মানুষ।"

কথাটা মনে ধরল সকলের। ছোটকাকাও ঘাড় নেড়ে বললেন, "কথাটা একেবারে ফেলে দেওয়ার মতো নয়।"

আর আলোচনা এগোল না। মা উঠে এলেন ছাদে। পিছন-পিছন হাজার পা সেরে বাবাও। আনন্দের সঙ্গে বললেন, "লাভলি জায়গা! এত চুপচাপ চারদিক যে, কানে যেন তালা লেগে যাচ্ছে।"

মা বললেন, "তোমার লাভলি তোমার কাছে রেখে দাও। আমি কালই ফিরে যাব। হাতি আর গুন্ডা-বদমাশ সব একসঙ্গে! আমার বুকের ভিতরে যে কী হচ্ছে, আমিই জানি।"

বাবা থামার নাম করলেন না। বলে চললেন, "নীচে পায়চারি করতে-করতে দেখলাম, চাঁদও উঠছে। ওফ, চাঁদের আলোয় যা লাগবে না জায়গাটা!"

"চাঁদ? কই-কই?"

সৌমিতা উঠে পড়ল। বাবা বললেন, "সে কী! আমার এত বড় একজন প্রকৃতিপ্রেমিক মেয়ে, তারই চোখে পড়েনি? আয় দেখাচ্ছি।"

বাবা এগিয়ে গিয়ে ছাদের এক কোণ দিয়ে আকাশের দিকে আঙুল তুলে দিলেন। সৌমিতা স্তব্ধ হয়ে গেল। বাংলোর কম্পাউন্ডের আকাশছোঁয়া মস্ত এক শালগাছের ফাঁক দিয়ে চাঁদমামা উঁকি দিয়ে যাচ্ছে। মোটামুটি বড়ই, শুধু মাথার দিকটা একটু খাওয়া-খাওয়া। যখন মাঝ আকাশে উঠে আসবে, তখন ভোল্টেজে চারদিক মাত করে দেবে। সেই সময় ড্যামের পাড়ে বসে থাকলে কেমন হয়? ভাবতেই গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল সৌমিতার। কতক্ষণে যে রাত বারোটা বাজবে।

পৃথিবীতে কিছুই থেমে থাকে না। রাত বারোটাও থাকল না। সৌমিতা বিছানা থেকে নেমে সাবধানে কিটটা কাঁধে ঝুলিয়ে, ঘরের দরজা খুলে পা টিপেটিপে বেরিয়ে এল বারান্দায়। বারান্দায় ছোট একটা বাল্‌ব জ্বলছিল। তার আলোয় ওড়াউড়ি করছিল কত রকমের পোকা। ছোটকাকা আগেই বেরিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন বারান্দার সিঁড়ির কাছে। সঙ্গে পপাই। তারা বেরনোর জন্য রেডি।

"কী রে, তাতানকে আনলি না?" ছোটকাকা চাপা স্বরে জিজ্ঞেস করলেন।

সৌমিতা গলা নামিয়ে বলল, "ওকে আজ ছেড়ে দাও ছোটকা, অঘোরে ঘুমোচ্ছে বেচারা। ওকে তুলতে গেলে মা উঠে পড়বেন।"

অভিযানে বেরোলেই ছোটকাকার চেহারা অন্য রকম হয়ে যায়। কথায়-কথায় রেগে যান। সৌমিতার কথাতেও রেগে উঠলেন, "যা নির্দেশ দেওয়া ছিল, সেটা তোমার মান্য করা উচিত ছিল মিতা। তোমরা এরকম ইনডিসিপ্লিনড হলে ক্লাব চলতে পারে না।"

সৌমিতা মাথা নিচু করে বলল, "সরি ছোটকা। আমি ডেকে আনছি তাতানকে।"

"থাক, আর ডাকতে হবে না। বউদির ঘুম ভেঙে গেলে সব মাটি হয়ে যাবে," ছোটকাকা গজগজ করে উঠলেন, "কাল ব্যবস্থা হবে তাতানের।"

পপাই বলল, "টর্চটা বের কর মিতা।"

সৌমিতা বলল, "টর্চ লাগবে না। কেমন চাঁদের আলো বাইরে।"

সত্যিই তাই। চাঁদের আলো ফুটফুট করছে কম্পাউন্ডের মধ্যে। গাছগুলোকে মনে হচ্ছে চাঁদের আলোয় ধুইয়ে দিয়েছে কেউ। তার মধ্যে এক-একটার মাথায় থোকা-থোকা জোনাকি। সৌমিতা হাঁ করে চেয়ে রইল। কোথায় লাগে হাতি এর পাশে।

"আরে চল। ছোটকা এগিয়ে গিয়েছে," পপাই ঠেলা দিল সৌমিতাকে।

সৌমিতা হাঁটতে শুরু করল। চার-পাঁচ পা বড়জোর। তার পরেই একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটে গেল। মাটি ফুঁড়ে হঠাৎ কে যেন সামনে এসে দাঁড়াল। মাঝারি হাইটের একজন লোক। মাথায় টুপি, হাতে বন্দুক। ছোটকাকার পথ আড়াল করে খসখস করে বলল, "এত রাতে কোথায় যাচ্ছেন স্যার?"

কয়েক সেকেন্ড কথা ফুটল না ছোটকাকার মুখে। বন্দুকওলা লোকটার মুখটা কীরকম, ধরা যাচ্ছে না। লোকটা কোত্থেকে এল, তা-ও ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। পপাই ছোটকাকাকে সরিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল। গলা তুলে জিজ্ঞেস করল, "কে আপনি?"

লোকটা বন্দুক নামিয়ে নিয়ে বলল, "আমরা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের লোক। ডি এফ ও সাহেব আপনাদের সিকিউরিটির জন্য আমাদের এখানে পোস্টিং করে দিয়ে গিয়েছেন।"

"আমরা মানে?" ছোটকাকার মুখে কথা জোগাল।

"আমরা দু'জন আছি স্যার। আমি আর রঘু।"

"আপনারা ছিলেন কোথায় এতক্ষণ?"

"কেয়ারটেকারের ঘরে। আপনারা যতদিন থাকবেন, ততদিনই আমরা থাকব। স্যারের সেই রকমই অর্ডার।"

"ও," বলে ছোটকাকা চট করে গলাটা প্রচণ্ড গম্ভীর করে ফেললেন, "ঠিক আছে। আপনি এখন রেস্ট নিন। আমরা একটু বেরোব।"

"এখন?" লোকটা চমকে গেল।

"হ্যাঁ, এখন। দয়া করে আমাদের মেন গেটটা খুলে দিন।"

লোকটা বলল, "না স্যার, বাইরে যাবেন না। অর্ডার নেই।"

পপাই তেতে উঠল, "দরজা খুলুন।"

"ও কথাটি বলবেন না। এই রাতে দরজা খুললে ডি এফ সাহেব আমাদের খেয়ে ফেলবেন। চাকরি চলে যাবে স্যার।"

সৌমিতা বলল, "আমরা বাইরে যাচ্ছি, কে আর জানতে পারছে? ভোর হওয়ার আগে আমরা ঠিক ফিরে আসব।"

তবু লোকটা সমানে ঘ্যানঘ্যান করে চলল। আসলে সে ভয় পাচ্ছিল, এই রাতে বাইরে বেরিয়ে এরা যদি বিপদে পড়ে, তা হলে তার দায় তাদের উপরেই চাপবে। তখন তাদের আর কেউ বাঁচাতে পারবে না। পপাইয়ের একটুতেই মাথা গরম হয়ে যায়। সে রেগেমেগে লোকটাকে দু'-চার কথা শুনিয়ে দিল। রাইটার্সে রিপোর্ট করার ভয়ও দেখাল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। শেষ পর্যন্ত ছোটকাকাও হাল ছেড়ে দিলেন। বললেন, "থাক তা হলে। এত করে বলছেন যখন।"

লোকটি বলল, "হ্যাঁ স্যার, এখন বাইরে বেরোবেন না। শুনলাম, আজ আবার হাতিও বেরিয়েছে।"

"আরে, সেই হাতি দেখতেই তো আমরা যাচ্ছিলাম," পপাইয়ের স্বরে বেশ ঝাঁঝ, "দিলে আমাদের সব প্ল্যান গুবলেট করে।"

"অ্যাঁ!" লোকটার মুখ থেকে আর কথা বেরোল না।

শুধু কি হাতি? সৌমিতার মন ভেঙে গেল। সে হতাশ হয়ে বাংলোর বারান্দায় গিয়ে বসে পড়ল। চাঁদের আলোয় চারদিক ভেসে যাচ্ছে। এখানেই এই, ড্যামে গিয়ে দাঁড়ালে কেমন লাগবে এখন? সৌমিতার চোখের সামনে আস্তে-আস্তে একটা ছবি ফুটে উঠল। ড্যাম খাঁ-খাঁ করছে। চারপাশের পাহাড়গুলো একা-একা রাতপাহারা দিচ্ছে। কেউ দেখছে না, কেউই শুনছে না। তবু আপনমনে ছলাৎ-ছলাৎ করে জলাধারের জল তীরে এসে ভেঙে পড়ছে। তার সঙ্গে চুরমার হয়ে যাচ্ছে শত-শত চাঁদ। সরু গোঁফওলা সরকারি লোকটিকে বেছে-বেছে আজই আসতে হল!

সৌমিতার কান্না পেয়ে গেল। কিন্তু সে এখন অ্যাডাল্ট, কাঁদে কী করে? তাড়াতাড়ি বারান্দা থেকে উঠে আস্তে-আস্তে এগিয়ে গেল ঘরের দিকে। ঠিক তখনই একটা ঘটনা ঘটে গেল। তার চোখ গেল কাঁটাতারের বেড়ার দিকে। বাইরে একটা জ্বলজ্বলে চোখের মতো কী যেন জ্বলছে-নিভছে।

"কী দেখছিস?" পিছন থেকে ফিসফিস করে উঠলেন ছোটকাকা।

উত্তেজনায় গলা আটকে এল সৌমিতার, "ছোটকা, হাতি!"

"উহুঁ, উহুঁ, হাতি নয়, হাতি নয়। টর্চের আলো। ভাল করে দ্যাখ। কেউ কাউকে সিগনাল দিচ্ছে। নরেশ সিংহ নয় তো?"

পপাই পিছনেই ছিল। একে তার মেজাজ খাট্টা, কথাটা কানে যেতেই দুদ্দাড় করে ছুটল সেদিকে। সৌমিতা আর ছোটকাকাই বা পড়ে থাকেন কেন? তাঁরাও গেলেন। বাংলোর পাশেই বিশাল খাদ। গাছপালা, ঝোপজঙ্গলে ঠাসা। একটানা নেমে গিয়েছে ড্যামের তলার রাস্তায়। ওরা গিয়ে দেখল, কেউ কোথাও নেই, খাদের মধ্যেই মিলিয়ে গিয়েছে টর্চের আলো। লোকটা হয় পড়েছে নীচে, নয় গা ঢাকা দিয়েছে কোথাও।

"কী হয়েছে স্যার?"

দৌড়তে-দৌড়তে এসে পড়েছে সিকিউরিটিটা। পকেট থেকে টর্চ বের করে জ্বালিয়ে দিল। সৌমিতা চুপ করে রইল। উত্তরটা ছোটকাকাই দিন। ছোটকাকা তখনও কাঁটাতারের বেড়ার উপর দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ঝুঁকে আছেন নীচের দিকে। আরও কয়েক সেকেন্ড সেই ভাবে থেকে ঘুরে দাঁড়ালেন। সিকিউরিটিকে লক্ষ করে শুধু বললেন, "কিছু না।"

॥ ৪ ॥

পরের দিন সকালে একটু বেলা করেই ঘুম ভাঙল সৌমিতার। মা-বাবা কখন উঠে পড়েছেন। ছোটকাকা ভোর পাঁচটা বাজার পর এক মিনিটও বিছানায় থাকেন না। এখানেও তাই। পপাই কম্পাউন্ডের মধ্যে ঘুরঘুর করছিল। মুখখানা তার বেজায় গম্ভীর। এখনও রোদ্দুর না উঠলেও খইয়ের মতো সাদা সকাল ঝকঝক করছে।

মুখ-হাত ধুয়ে সৌমিতা ছুটল বাইরে। সিকিউরিটির একজন বন্দুকটা পাশে রেখে, গেটের কাছে ঘাঁটি গেড়ে বসে আছে। তার সামনে বাংলোর কেয়ারটেকার মনভোলা মাঝি। সৌমিতাকে দেখে মনভোলা ঘাড়টা সামান্য দুলিয়ে চলে গেল তার ঘরের দিকে। এখান থেকে দেখা যাচ্ছিল তার ঘরটা। বাইরে একটা চৌপাই পাতা। তার উপর চিৎপাত হয়ে নাক ডাকাচ্ছে কাল রাতের রক্ষীটি। ওর নাম তো জানা যায়নি কাল, তবে এর নাম মনে আছে সৌমিতার, রঘু। রঘু লোকটি মাথায় বেশ খাটো। মুখের মধ্যে নেপালি-নেপালি ধাঁচ আছে। গোঁফ-দাড়ি নামমাত্র, রংও খুব কালো নয়।

"কাল রাতের কথা শুনেছেন কিছু?" সৌমিতা গম্ভীরভাবে বলল তাকে।

রঘু ঘাড়টা কাত করে দিল একপাশে। শুনেছে।

সৌমিতা আবার প্রশ্ন করল, "কেয়ারটেকারকে সব জানিয়ে দিয়েছেন নাকি?"

রঘু উত্তর দিল, "না, দিদিমণি।"

"আমার মা-বাবাকে?"

"না।"

সৌমিতা নিশ্চিন্ত হল, "হ্যাঁ। বলবেন না কাউকে। আপনাদের স্যারকেও জানাবেন না।"

কম্পাউন্ডের ভিতরটা চমৎকার করে সাজিয়েগুছিয়ে রেখেছে মনভোলা। ফুলের গাছটাছ করেছে অনেক রকম। ফড়িং, প্রজাপতি উড়ছিল। কাঠবিড়ালি দৌড়ে-দৌড়ে বেড়াচ্ছিল। ঘাসের ঝোপ থেকে ভোরের মাটির টাটকা গন্ধ ভেসে আসছে। কম্পাউন্ডের ভিতরে প্রচুর গাছ। ইউক্যালিপটাস, শাল, পলাশ, দেবদারুই বেশি। গেটের কাছে একজোড়া ঝাউও আছে। একটু হাওয়া দিলে পাতার এমন আওয়াজ হয়, যেন ঝড় বইছে। গোল

হয়ে ঘুরতে-ঘুরতে সমানে পাতা খসে পড়ছিল এ গাছ সে গাছ থেকে।

সৌমিতা জিজ্ঞেস করল, "কাল কে টর্চ জ্বেলেছিল খবর পেলেন কিছু?"

লোকটা যন্ত্রের মতো ঘাড় নেড়ে বলল, "না, দিদিমণি।"

সৌমিতা বিরক্ত হয়ে গেল। না ছাড়া কি আর কথা নেই এর ডিকশনারিতে? ভিতর থেকে মা টিফিন খাওয়ার জন্য ডাকাডাকি জুড়ে দিলেন। পপাইয়ের হাতে একটা কঞ্চি। সে সেটা শাঁইশাঁই করে ঘোরাচ্ছিল। এগিয়ে এল সৌমিতার কাছে। রাগের গলায় বলল, "ছোটকা রেগে আগুন হয়ে গিয়েছে। বলছিল, আজই ফিরে যাবে। এখানে যে টেলিফোনটা আছে, সেটা দিয়ে অনেক চেষ্টা করেও বাবাকে ধরতে পারছি না। ওই দু'টো লোক যদি সব সময় ঘাড়ের উপর নজর দিয়ে বসে থাকে, ভাল লাগে?"

"হুঁ," সৌমিতা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে মাথা নেড়ে বলল, "ওদের জন্যই কাল ফেস টু-ফেস হাতি দেখার চান্সটা মিস হয়ে গেল।"

পপাই বলল, "ঠিক বলেছিস। হাতি দেখতে পেলে, আমি তো ঠিকই করে রেখেছিলাম ঢিল ছুড়ব। মাস্টারমশাই যেসব টিপ্‌স দিয়েছিলেন, হাতেনাতে টেস্ট করে দেখব।"

সৌমিতা হাল্‌কা চালে বলল, "কেন টেস্টিং তো করেছিস, হাতির বদলে টর্চওয়ালার উপর দিয়ে। ওরকম হুড়মুড় করে বোকার মতো তেড়ে গেলি কেন?"

"ভুল হয়ে গিয়েছে। বদমাশটা পালাল," পপাই মুষড়ে পড়ল, "এবারে আমাদের টুরটা একদম জমছে না। যত রাজ্যের উলটোপালটা ব্যাপার ঢুকে যাচ্ছে।"

সৌমিতা সায় দিল, "যা বলেছিস। আমাদের সৃষ্টিছাড়া অ্যাডভেঞ্চার ক্লাব এবার পুরো ফ্লপ।"

ভিতরে গিয়ে সৌমিতা দেখল, তাতান ঘুম থেকে উঠে পড়েছে। বেসিনের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁত ব্রাশ করছে। রাতে চমৎকার ঘুম হয়েছে। বাবার মেজাজ দারুণ খুশ। সকালে উঠে রোজ তাঁর ঘণ্টা দেড়েক ধরে তিন-চারখানা কাগজ পড়া চাই। কাগজ পড়া আর দাড়ি কামানো, এই দু'টো জিনিস ঠিকমতো না হলে বাবার মেজাজ বিগড়ে যায়। কিন্তু এখানে কাগজের নাম করলেন না। দাড়ি কামানোর গরম জলের জন্যও মাকে তাড়া লাগালেন না। ব্রেকফাস্টের টেবিলে বসে আস্ত একটা মরিচ-টোস্ট মুখের ভিতর চালান করে দিয়ে চোখ বুজে চিবোতে-চিবোতে সৌমিতাকে বললেন, "বুঝলি, খিদেটিদেগুলো মিরাক্‌লের মতো বেড়ে গিয়েছে। শরীরটাও অদ্ভুত ফ্রেশ লাগছে। কলকাতার এঁদো গলিতে ফিরে না গিয়ে এখানেই বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিলে হয় না?"

সৌমিতা বলল, "একদম হয় না।"

"কেন?" মুখের ভিতর মরিচ-টোস্ট মিলিয়ে গেল বাবার।

সৌমিতা বলল, "কারণ, এখানে থাকলে হাতির পায়ের তলায় চেপটে মরতে হবে। শুনলে তো কাল।"

"সো হোয়াট?" বাবা বললেন, "আমাদের ওখানে গাড়ির তলায় চাপা পড়তে হয়, এখানে নয় হাতির তলাতেই চাপা পড়লাম। বেশ গর্জাস মৃত্যু।"

সৌমিতা হেসে ফেলল। কিন্তু মায়ের মুখে হাসির চিহ্নমাত্র নেই। হাতির কথায় তাঁর রক্তচাপ বেড়ে গিয়েছে। বললেন, "আজই বাড়ি চলো বাপু। এক রামে রক্ষে নেই, সুগ্রীব দোসর। হাতির সঙ্গে-সঙ্গে আবার খুনজখমও শুরু হয়ে গিয়েছে এখানে।"

ছোটকাকা থমথমে মুখে খেয়ে যাচ্ছিলেন। মুখ তুলে বললেন, "সেই ভাল। এবারে সুবিধে করা যাবে বলে মনে হচ্ছে না।"

"চলে যাবি?" একমাত্র বাবাকেই কিছুটা মনমরা লাগল।

তাতানের ব্রাশ করা শেষ। টাওয়েল দিয়ে মুখ মুছতে-মুছতে এসে বসল টেবিলে। ছোটকাকার দিকে তাকিয়ে বলল, "সত্যিই আজ ফিরে যাবে ছোটকা?"

ছোটকাকা একবার তাতানকে দেখে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। বললেন, "তোমার সঙ্গে কথা নেই।"

তাতানের মুখখানা ছোট্ট হয়ে গেল। সৌমিতার কেমন মায়া লাগল ভাইকে দেখে। ছোটকাকা বড্ড বেশি রকম কড়া ধাতের নেতা তাদের।

"কেন, ও আবার কী করল?" মা জানতে চাইলেন।

ছোটকাকা কোনও কথা না বলে উঠে চলে গেলেন। বাবা অসন্তুষ্ট হলেন। মাকে বললেন, "তুমি কেন কথা বলো ওদের ব্যাপারে? ওদের ব্যাপার ওদেরই বুঝে নিতে দাও না।"

ব্রেকফাস্ট সেরে বাইরে বেরোতেই মাস্টারমশাইয়ের দর্শন মিলল। আজ ধুতি নয়, পাজামা-পাঞ্জাবি পরনে। ভদ্রলোকের মুখচোখ মোটেই ভাল লাগছিল না। চাপা টেনশনে ভুগছেন মালুম পাওয়া যাচ্ছিল। হাতে তাঁর জিনিসপত্র ভরা পলিথিনের ব্যাগ। জানা গেল, রোজই সকালের দিকে তিনি ক্যানেল পেরিয়ে এদিকে আসেন। টুকটাক দোকানহাট সেরে, পরিচিত লোকজনের সঙ্গে একটু গল্পগাছা করে স্কুলে চলে যান। স্কুলটা কাছেই। সকাল ন'টায় শুরু হয়ে একটায় শেষ। তবে, আজ স্কুল নেই। এখনও পুজো ভ্যাকেশন চলছে।

"কাল রাতে বেরিয়েছিলেন না এক্সকারশনে?" মাস্টারমশাই ব্যাগ পায়ের ফাঁকে রেখে জিজ্ঞেস করলেন ছোটকাকাকে।

"না," ছোটকাকা বিরস মুখে মাথা নাড়লেন।

"ওফ্‌ বাঁচলাম! কাল আপনাদের কথা ভেবে একফোঁটা ঘুমোতে পারিনি। তার উপর বাজারে গিয়ে শুনলাম, একটা লোক ড্যামের রাস্তার নীচে হাড়গোড় ভেঙে পড়ে আছে। তার মানে হাতিঠাকুর কাল এই তল্লাটে ঢুঁ মেরেছে।"

সৌমিতা তাকাল-ছোটকাকার দিকে। ছোটকাকা পপাইয়ের দিকে। পপাই ফট করে বলে ফেলল, "না, না, হাতিতে মারেনি তাকে। মনে হচ্ছে, খাদে পড়ে মারা গিয়েছে।"

"খাদে পড়ে? কী করে জানলে?" মাস্টারমশাই জিজ্ঞেস করলেন।

পপাইয়ের মাথায় পদার্থ বলে যদি কিছু থাকে! তাড়াতাড়ি সৌমিতা বলল, "ওটা ওর একটা ধারণা। শুনছি, কিছুদিন হল এখানে উলটোপালটা ব্যাপার ঘটছে। নানারকম দুষ্কৃতী ঢুকে গিয়েছে জঙ্গলে। নিজেদের মধ্যে লড়াই-ঝগড়া করেও লোকটা মরতে পারে।"

মাস্টারমশাই তাকিয়ে আছেন সৌমিতার দিকে। কয়েক সেকেন্ড। তারপরেই হঠাৎ গলার স্বর পালটে গেল তাঁর, "কে তোমাদের মাথায় এসব ঢুকিয়েছে বলো তো? কে, অ্যাঁ?"

"আপনাদের ডি এফ ও সুসময় নন্দী। কাল উনি এখানে

এসেছিলেন," ছোটকাকা গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন।

"বটে? কী বলেছেন নন্দী?"

ছোটকাকা ডি এফ ও সুসময়বাবুর ভার্সান জানালেন মাস্টারমশাইকে। মন দিয়ে সব শুনে মাস্টারমশাই এককথায় সমস্ত উড়িয়ে দিলেন। বললেন, "না, না, নন্দীসাহেব বাড়িয়ে বলছেন। ওসব অনেক আগে ছিল, এখন নেই। পুলিশের যেমন কেস দিতে না পারলে কাজ থাকে না, এঁদেরও তাই। অস্ত্র কেনাবেচা, যত রাজ্যের আজগুবি কথাবার্তা। এখানকার লোকজন দু'বেলা ভাল করে খেতেই পায় না, অস্ত্র কিনছে!"

ছোটকাকা জিজ্ঞেস করলেন, "তা হলে নরেশ সিংহ বলে কেউ নেই বলছেন?"

মাস্টারমশাই বললেন, "নরেশ সিংহ? হুঁ, ওই নামে একজন ডাকাত ছিল বটে, এখন আর নাম শুনতে পাই না। তবে, মোটরবাইকের কথাটা ঠিক। আজকাল মোটরবাইকের উৎপাত হয়েছে এদিকে। সব উঠতি যুবক। জঙ্গলের ভিতর দিয়ে শহরে যাওয়ার রাস্তা আছে শর্টকাট। সেখান থেকে তারা এখানে আসে ফুর্তির উদ্দেশ্যে। বিড়ি-সিগারেট খায়, তারপর যে-যার ঘরে ফিরে যায়। মধ্যে-মধ্যে একটু যে বাড়াবাড়ি করে না, তা নয়।"

ছোটকাকা আর তর্কে গেলেন না। কথায়-কথায় রোদ্দুর তেতে উঠছিল। ছোটকাকা ভিতরে আসার জন্য মাস্টারমশাইকে বললেন, "একটু চা খাওয়া যেতে পারে।"

মাস্টারমশাই ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, "না, না। এখন নয়। বিকেলে আসছি। আমার বাড়িতে নিয়ে যাব আপনাদের।"

সৌমিতা বলল, "আমরা এখন বন্দি। উপরের অর্ডার ছাড়া আমাদের বাইরে যাওয়ার উপায় নেই। এভাবে বেড়ানো হয়!"

"তার মানে?"

ছোটকাকা সিকিউরিটির বাড়াবাড়ির কথা বলে রাগ-রাগ গলায় বললেন, "ভাবছি আজই আমরা ফিরে যাব। আপনাদের ডি এফ ও সাহেব সব আনন্দ মাটি করে দিয়েছেন আমাদের।"

"রাখুন তো ডি এফ ও-র কথা। এখানে এলেন, জঙ্গল না দেখেই ফিরে যাবেন?" মাস্টারমশাই ব্যাগ তুলে নিলেন। বললেন, "চলুন, আমি কথা বলছি ওদের সঙ্গে।"

রঘু তখনও গেট আগলে বসে আছে। মাস্টারমশাইয়ের প্রস্তাব কানে যেতেই তার মূর্তি বদলে গেল। কে বলেছে, কথা বলতে পারে না? একেবারে ঝাঁ-ঝাঁ করে উঠল, অর্ডার ছাড়া সে কাউকে বাইরে যেতে দেবে না। বিকেলে তারা যদি মাস্টারমশাইয়ের বাড়ি যায়, সঙ্গে সে যাবে। মাস্টারমশাইয়ের বাড়ি যাওয়ার নাম করে তারা সোজা গিয়ে জঙ্গলে ঢুকে যাবে, সেটি হচ্ছে না। তারা কী চিজ, কাল তারা টের পাইয়ে দিয়েছে।

সকলে একটু হতাশ হলেও সেটাই মেনে নিল। এর মধ্যে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছেন বাবা-মা। তাঁদের পিছু-পিছু তাতানও। মা মুচকি-মুচকি হাসছিলেন। সৌমিতাকে লক্ষ করে বললেন, "ঠিক হয়েছে। এই বার জব্দ তোরা।"

"আমি ঠিক চারটে নাগাদ আসছি, রেডি হয়ে থাকবেন," মাস্টারমশাই বললেন, "কে-কে যাচ্ছেন আপনারা?"

ছোটকাকা বললেন, "সকলের যাওয়ার দরকার নেই। আমার সঙ্গে শুধু মিতা আর পপাই যাবে।"

"আমি?" তাতান আর্তনাদ করে উঠল।

ছোটকাকা সাফ বললেন, "তুমি যাবে না। তুমি ঘরে থাকবে। মা-বাবাকে দেখবে।"

মাস্টারমশাই অবাক হয়ে গেলেন, "সে কী, ও যাবে না তাই কখনও হয়? ছোট ছেলে।"

তাতান ছোটকাকার দিকে আকুল চোখে তাকাল। কথা বলার সাহস নেই তার। কাল রাতে তার ঘুমিয়ে পড়াটা যে গুরুতর অন্যায় হয়ে গিয়েছে, হাড়ে-হাড়ে টের পাচ্ছিল। ছোটকাকা মুখ ঘুরিয়ে নিলেন।

"এবারের মতো ওকে মাফ করে দাও ছোটকা," সৌমিতা আর্জি জানাল।

পপাইও গলা মেলাল সৌমিতার সঙ্গে, "হ্যাঁ ছেড়ে দাও ছোটকা। আর ও করবে না।"

"বল না তুই," সৌমিতা তাতানকে ঠেলল, "ছোটকাকে বল, আর এরকম হবে না, বল।"

তাতান সঙ্গে-সঙ্গে মুখখানা কাঁদো-কাঁদো করে ফেলল। কান্না-কান্না গলায় বলল, "ছোটকা, আমার অন্যায় হয়ে গিয়েছে।"

এতক্ষণে যেন বরফ গলল। ছোটকাকা বললেন, "ঠিক বলছিস?"

"ঠিক।"

"আর কোনও দিনও এরকম বেয়াদপি করবি না?"

সঙ্গে-সঙ্গে তাতানের মুখখানা হাসিতে ঝলমল করে উঠল। মাস্টারমশাই কিছুই বুঝতে পারছিলেন না। বাবা একবার মায়ের মুখের দিকে, মা একবার বাবার মুখের দিকে তাকাচ্ছিলেন। পাছে পপাই আবার মুখ ফসকে কিছু বলে দেয়, সৌমিতা তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "ও একটা অন্যায় করে ফেলেছে।"

মাস্টারমশাই বেশি কৌতূহল দেখালেন না। শুধু একটা "ও" বলে মাথা নেড়ে বললেন, "তা হলে আপনারা মোট হলেন চারজন।"

ছোটকাকা ঘাড় নাড়তে-নাড়তে থেমে গেলেন। গেটের বাইরে ভটভট শব্দ করে এসে থামল একটা অটোরিকশা। তার পরেই দুমদুম করে কে যেন গেটের উপর ধাক্কা মারতে শুরু করল। কচি গলায় চিৎকার করছিল দরজা খুলে দেওয়ার জন্য। খুব চেনা-চেনা গলাটা সৌমিতার।

আনন্দে সৌমিতার চোখ গোল হয়ে গেল। ছোটকাকার দিকে তাকিয়ে উত্তেজিত গলায় বলল, "বাবলি! বাবলি! বাবলি! এসেছে।"

"বাবলি! ভ্যাট!" ছোটকাকা বিশ্বাস করতে পারলেন না।

"হ্যাঁ, আমি বলছি বাবলি," সৌমিতা রঘুর দিকে ফিরল, "শিগগির গেট খুলুন! আমাদের লোক এসেছে।"

রঘু পকেট থেকে চাবি বের করে গেটটা খুলে দিতেই তিড়িংবিড়িং করে লাফাতে-লাফাতে ভিতরে ঢুকে এল বাবলি। সত্যিকারেরই বাবলি। পরনে লাল টুকটুকে ফ্রক। মাথায় নীল রঙের হেয়ারব্যান্ড, পায়ে কেড্‌স।

"আরে তাই তো! এ যে বাবলি!" মা চেঁচিয়ে উঠলেন।

বাবলি দৌড়ে এসে সৌমিতাকে জড়িয়ে ধরল। সৌমিতা তার গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করতে-করতে ডগমগ হয়ে গেল খুশিতে, "তুই কোথা থেকে এলি বাবলি। উঃ, আমি তো বিশ্বাসই করতে পারছি না!"

গেট ঠেলে ভিতরে ঢুকে এলেন বাবলির বাবা। বাইরে দাঁড়িয়ে তিনি অটোরিকশার ভাড়া মেটাচ্ছিলেন। বেশ মোটাসোটা থলথলে চেহারা বাবলির বাবার। বাবলির মতো তাঁর মুখখানাও সব সময় হাসি-হাসি। হাসতে-হাসতেই তিনি যা বললেন, তাতে জানা গেল, বাবলি তাদের সঙ্গে লালতটিতে আসতে না পারায় ভয়ংকর মুষড়ে পড়েছিল। খাচ্ছিলদাচ্ছিল না, কারও সঙ্গে কথা বলছিল না, বিছানায় মুখ গুঁজে সমানে কান্নাকাটি করছিল। তার অবস্থা দেখে শেষকালে অনেক কষ্টে অফিসে ফোন করে একদিনের ছুটি বের করে উনি কাল রাতেই ট্রেন ধরে সোজা চলে এসেছেন।

"কী যে ঢুকিয়েছেন ওর মাথায়, আমাদের একেবারে পাগল করে মারছিল," বাবলির বাবা বললেন ছোটকাকাকে, "এখন ঠেলা সামলান।"

ছোটকাকা হেসে ফেললেন, "চিন্তা করবেন না। ও এখানে ভালই থাকবে।"

"হ্যাঁ, দেখবেন একটু। যা চঞ্চল মেয়ে।"

চঞ্চল মেয়ে ততক্ষণে সৌমিতাকে ছেড়ে চলে গিয়েছে মায়ের কাছে। মা তাকে আদর করতে শুরু করেছেন। কিন্তু আদর খাওয়ার জন্য সে যেন বসে আছে। মাকে ছেড়ে সে "কী সুন্দর" বলে গোটা কম্পাউন্ডটা একদৌড়ে চক্কর মেরে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে মাস্টারমশাইয়ের সামনে। বড়-বড় চোখে সে দেখছিল মাস্টারমশাইকে। মাস্টারমশাইয়েরও চোখের পলক পড়ছিল না।

"কে বলো তো বাবলি? উনি একজন মাস্টারমশাই। খুব সাবধান," বাবা বলে উঠলেন।

"মাস্টারমশাই! কী মজা," আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল বাবলি, "এখানেও মাস্টারমশাই!"

সৌমিতা হাসতে-হাসতে ঘুরে গেল তাতানের দিকে, "দ্যাখ, বাবলির কী সাহস, মাস্টারমশাই শুনেও ভয় পেল না তোর মতো।"

তাতান লজ্জা পেয়ে গেল, "ভ্যাট!"

ছোটকাকা ফিরল মাস্টারমশাইয়ের দিকে, "তা হলে মাস্টারমশাই, অল টোটাল আমরা পাঁচজন হলাম, চারজন নয়। বাবলিও বিকেলে আমাদের সঙ্গে যাচ্ছে।"

"হুঁ যাবে বইকি। নিশ্চয়ই যাবে," মাস্টারমশাই এগিয়ে গিয়ে বাবলিকে আদর করে দিয়ে বললেন, "এ মেয়ে মাস্টারমশাইকে দেখে ভয় পায় না, একে তো নিয়ে যেতেই হবে।"

মাস্টারমশাই চলে গেলেন। বাবলি আর দেরি করল না, লেগে গেল তার কাজে। হুটোপাটি, দাপাদাপি, খুনসুটি, চিৎকার-চেঁচামিচি করে অস্থির করে তুলতে লাগল সকলকে। ওকে দেখে কে বলবে, সারারাত ট্রেনজার্নি করে এসেছে। সকালের ব্রেকফাস্টও ভালমতো হয়নি। ওর রকমসকম দেখে হেসে গড়িয়ে পড়ছিল সকলে। দেখতে-দেখতে সৌমিতাদের মনের মেঘ কেটে যাচ্ছিল। বাংলোটাও আবার যেন প্রাণ ফিরে পাচ্ছিল। সত্যিই ভারী চঞ্চল মেয়ে!

বাবলির অনারেই স্থির হল, কালকের দিনটা থেকে পরশু দিন ফেরত যাওয়া হবে।

॥ ৫ ॥

দুপুরে খাওয়াদাওয়া করে উঠে একটু রেস্ট নিয়ে বাইরে এসে বসতেই সৌমিতার মন আনন্দে ভরে গেল। দিনের বেলায় অন্ধকার নেমে এসেছে। ঠান্ডা-ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছিল। প্রচুর ফড়িং

ওড়াউড়ি করছে। আকাশে চিৎকার করে ঘুরপাক খাচ্ছে চামচিকের দল। থেকে-থেকে চারপাশে আলোর ঝলক তুলে চমকে-চমকে উঠছে বিদ্যুৎ। বৃষ্টি নামল বলে। হয়ে গেল আজ বিকেলে মাস্টারমশাইয়ের বাড়ি!

বাবলিকে এখানে পৌঁছে দিয়ে বেলা এগারোটার দিকে বেরিয়ে গিয়েছেন তার বাবা। সাড়ে বারোটায় ট্রেন আছে একটা। সেটা ধরলে রাত দশটা নাগাদ তিনি কলকাতায় পৌঁছে যাবেন। তাঁর এত তাড়াতাড়ি ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে কারওরই সায় ছিল না। সকলেই চাইছিল, তিনি একটা রাত অন্তত থাকুন। কিন্তু তাঁকে কিছুতেই রাজি করানো গেল না। পরের দিন তাঁকে অফিসে জয়েন করতেই হবে। যাওয়ার আগে তিনি ছোটকাকার দু' হাত ধরে বলেছিলেন, "আপনাদের ভরসায় ওকে এখানে রেখে গেলাম। একটু সামলেসুমলে রাখবেন।"

ছোটকাকা তাঁকে নিশ্চিন্ত করে বলেছিলেন, "ভাববেন না, আমরা আছি।"

শুরু হয়ে গেল বৃষ্টি। ছিটেফোঁটা বৃষ্টি, কিন্তু কী কানফাটানো শব্দ। আসলে, বাংলোর ভিতর অনেক রকম গাছপালা থাকার দরুনই এটা হচ্ছিল। তার চেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, জলের ফোঁটা চোখে পড়ছে না। গাছের ডালপাতা আর উত্তাপই সব জল শুষে নিচ্ছিল। তবে, জলের বদলে ঝরে পড়ছিল গাছের পাতা। ফোয়ারার মতো, অজস্র। সৌমিতা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। এরকম অদ্ভুত দৃশ্য সে আগে দেখেনি।

"বৃষ্টি! বৃষ্টি!"

তাড়াতাড়ি খাইয়েদাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল বাবলিকে। বৃষ্টির শব্দে ঘুম ভেঙে গিয়েছে তার। লাফাতে-লাফাতে বেরিয়ে এসেছে বাইরে। সৌমিতা ধরে ফেলল তাকে, "অ্যাই বাবলি, কোথায় যাচ্ছিস?"

"বাইরে। বৃষ্টিতে ভিজব," বাবলির পরিষ্কার কথা।

"একদম না," সৌমিতা শক্ত করে চেপে ধরল বাবলিকে, "অসময়ের বৃষ্টি, জ্বরে পড়ে যাবি।"

"যাই যাব।"

খেয়েদেয়ে সকলেই একটু গড়িয়ে নিচ্ছিল। বাবলির হুটোপাটিতে সকলের ঘুম ভেঙে গিয়েছে। একে-একে বেরিয়ে এলেন ছোটকাকা, তাতান, পপাই, সব শেষে মা। একমাত্র বাবারই ঘুম ভাঙেনি। বাবার এই গুণটা আছে। একবার ঘুমিয়ে গেলে কানের কাছে ড্রাম পেটালেও জাগবেন না। সকলে মিলে ব্যস্ত হয়ে পড়ল বাবলিকে ধরে রাখতে। ততক্ষণে গাছের ডালপাতা থেকে বৃষ্টির জল ঝরতে শুরু করেছে। আস্তে-আস্তে মাটি ভিজে যাচ্ছিল।

"আ-আ-আহ্," বুক ভরে অনেকক্ষণ ধরে মাটির গন্ধ নিয়ে সৌমিতা বলল, "কী সুন্দর গন্ধ, তাই না ছোটকাকা?"

ছোটকাকা ঘাড় দুলিয়ে বললেন, "এর জন্যই তো বাইরে আসা। কলকাতার পিচের রাস্তায় পাবি এসব?"

বৃষ্টিটা যেমন হঠাৎ করে এসেছিল, হঠাৎ করেই থেমে গেল। তারপর পাঁচ মিনিটও গেল না, রোদ্দুর ঝলমল করে উঠল। বাবলিকে আর ধরে রাখা গেল না। "রোদ্দুর, রোদ্দুর, রোদ্দুর উঠেছে," বলে বারান্দা থেকে নেমে পড়ল নীচে। তাতানও গেল তার সঙ্গে। বারান্দায় পায়চারি করতে-করতে বারবার গেটের দিকে তাকাচ্ছিল পপাই। ছোটকাকাও ঘনঘন হাতঘড়ি দেখছিলেন, কখন মাস্টারমশাই আসেন।

মাস্টারমশাই অবশ্য বৃষ্টি থামার দশ মিনিটের মধ্যে এসে পড়লেন। গায়ে সকালেরই পোশাক। মিটিমিটি হাসছিলেন। হাতে ছাতা নিয়ে বেরনোর বোধ হয় চল নেই এখানে। একদম ঝাড়া হাত-পা।

ছোটকাকা বললেন, "আপনার পাংচুয়ালিটির প্রশংসা করতে হয়।"

"থ্যাঙ্ক ইউ। চলুন।"

গেটের কাছে সকাল থেকে ঘাঁটি গেড়ে বসে আছে রঘু। বৃষ্টির সময়ও সৌমিতা তাকে দেখছিল, কেয়ারটেকারের ঘর থেকে তাকিয়ে বসে আছে গেটের দিকে। সিনসিয়ারিটির সত্যিই তুলনা নেই এদের। যাওয়ার আগে সে কেয়ারটেকারের ঘর থেকে রাতের পাহারাদার শ্যামলালকে ডেকে এনে তার জায়গায় দাঁড় করিয়ে দিল। তারপর গেটের চাবি খুলে দিয়ে ঘাড়ে বন্দুক ফেলে রেডি হল।

স্টার্ট করার আগে মাস্টারমশাই বাবলিকে ডাক দিলেন, "তুমি আমার সঙ্গে এসো। মাস্টারমশাইকে দেখে কীরকম ভয় পাও না, একবার দেখি!"

বাবলি আনন্দের সঙ্গে চ্যালেঞ্জটা গ্রহণ করে একছুটে চলে এল। মাস্টারমশাইয়ের হাত ধরে উলটে তাঁকেই টানাটানি জুড়ে দিল। এ মেয়েকে আটকায় কে?

প্রথমে মাস্টারমশাই আর বাবলি, তারপর তাতানকে নিয়ে ছোটকাকা, তারপর পপাই আর সৌমিতা। সব শেষে বেশ খানিকটা তফাতে-তফাতে যাচ্ছিল রঘু। হাতে তার বন্দুক। বেশ একটা দর্শনীয় শোভাযাত্রা। লোকজন হাঁ করে দেখছিল তাদের। বেশিরভাগই বন থেকে ফেরা আদিবাসী লোকজন। বৃষ্টিতে ভিজে জাব হয়ে গিয়েছে। সারাদিন গাছ কেটে মাথায় কাঠের বোঝা নিয়ে ফিরছে দলে-দলে। চাষবাসের ভাল উপায় নেই, কলকারখানা নেই। এভাবে বন একা-একা এদের কতদিন টানবে! মনটা ভারী হয়ে এল সৌমিতার।

"সকালে আর-একটু হলে কাল রাতের ঘটনাটা মাস্টারমশাইকে বলে ফেলছিলাম," চলতে-চলতে পপাই বলল সৌমিতাকে, "তুই জোর বাঁচিয়েছিস।"

সৌমিতা বিরক্ত হল, "আরে বোকা, শুনলি না, লোকটা খাদে পড়ে মরেছে। তার জন্য তো আমরাই দায়ী। আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি তুই। জানতে পারলে পুলিশ আমাদের ছেড়ে দেবে?"

"ঠিক বলেছিস। থ্যাঙ্ক ইউ মিতা," বলে পপাই জানতে চাইল, "লোকটা কে ছিল বল তো?"

"টর্চওয়ালা? ঠিক বুঝতে পারছি না," সৌমিতা চিন্তিত গলায় বলল, "ছোটকাকা বলছিল, নরেশ সিংহ। হতেও পারে।"

"নরেশ সিংহ আমাদের বাংলোয় আসতে যাবে কেন? আমরা কি ওর আছে অস্ত্র কিনব?"

"সেটাই তো বুঝতে পারছি না।"

বলতে-বলতে ক্যানেল চলে এল। সামনেই ছোট একটা কালভার্ট। ওটা পেরোলেই মাস্টারমশাইয়ের বাড়ি। বাবলির হাত ধরে মাস্টারমশাই উঠে পড়লেন কালভার্টে।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

ফিলাডেলফিয়ার অদৃশ্য জাহাজ

১৯৪৩ সালে বিশ্বসেরা পদার্থবিদরা করেছিলেন ফিলাডেলফিয়া এক্সপেরিমেন্ট, যার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের নাম। কী ছিল সেই এক্সপেরিমেন্ট? এখনও তা রহস্যে ঘেরা।

লিখেছেন অনুরাধা সান্যাল

ভয়ংকর এক কাহিনি লেখা হয়েছে একটি জাহাজকে ঘিরে। কাহিনিটি এরকম— *আগুনের বলয় ঘিরে ধরেছে নাবিকদের শরীর। তারা জানে না এই আগুনের উৎস কোথায়? ... জীবন-মৃত্যুর মাঝামাঝি অবস্থায় শূন্যদৃষ্টিতে মৃত্যুর অপেক্ষায় স্ট্যাচুর মতো অবস্থায় থাকা মানসিক ভারসাম্যহীন মানুষগুলো। আর বাকি নাবিকরা বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গিয়েছে।*

প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ অনুযায়ী, 'সবুজ ঘন কুয়াশার মতো কিছু একটা সম্পূর্ণভাবে ঢেকে ফেলল জাহাজটিকে। কিছুক্ষণ পর কেটে গেল কুয়াশা। কিন্তু অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে বিশাল সেই জাহাজ। যেন আমাদের উপর একটা চাদর ফেলে দেওয়া হয়েছে...'

জাহাজটি নাকি কয়েক মুহূর্তের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফিলাডেলফিয়া থেকে পেনসিলভানিয়া, নরফোক, ভার্জিনিয়া হয়ে আবার ফিরে এসেছিল ফিলাডেলফিয়া বন্দরে। এও কি সম্ভব! তেষট্টি বছর ধরে এই রহস্য উদ্ধারে ব্যস্ত গবেষকদের উত্তর, "হ্যাঁ।"

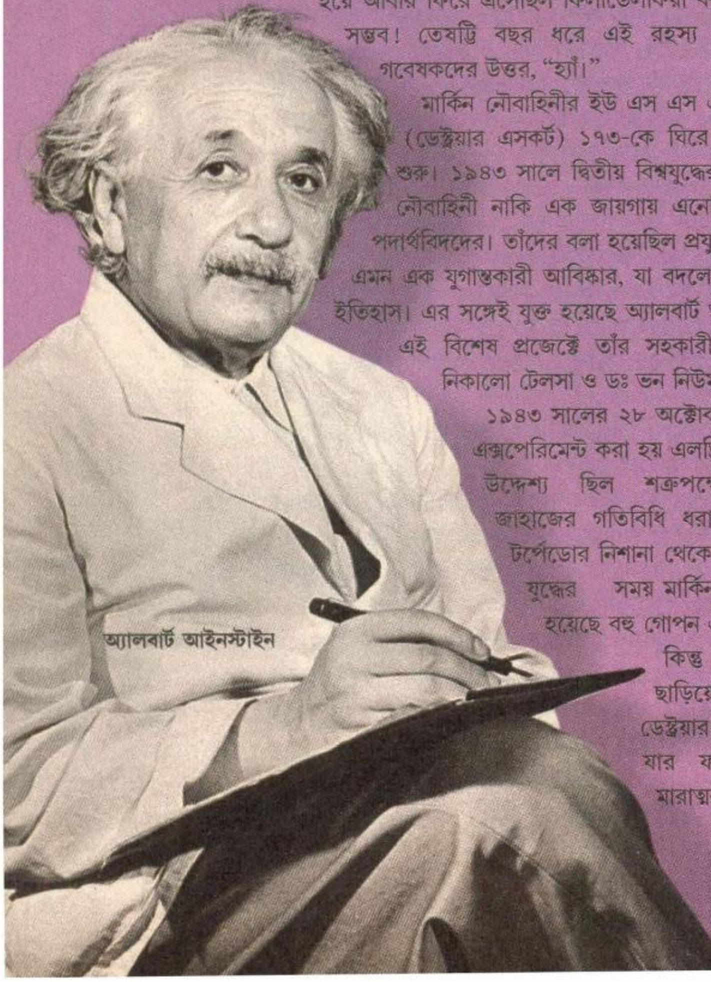

অ্যালবার্ট আইনস্টাইন

মার্কিন নৌবাহিনীর ইউ এস এস এলড্রিজ ডি ই (ডেস্ট্রয়ার এসকর্ট) ১৭৩-কে ঘিরে এই রহস্যের শুরু। ১৯৪৩ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মার্কিন নৌবাহিনী নাকি এক জায়গায় এনেছিল বিশ্বসেরা পদার্থবিদদের। তাঁদের বলা হয়েছিল প্রযুক্তিবিদ্যায় চাই এমন এক যুগান্তকারী আবিষ্কার, যা বদলে দেবে নেভির ইতিহাস। এর সঙ্গেই যুক্ত হয়েছে অ্যালবার্ট আইনস্টাইন ও এই বিশেষ প্রজেক্টে তাঁর সহকারী হিসেবে ডঃ নিকালো টেলসা ও ডঃ ভন নিউম্যান-এর নাম।

১৯৪৩ সালের ২৮ অক্টোবর এক বিশেষ এক্সপেরিমেন্ট করা হয় এলড্রিজ-কে নিয়ে। উদ্দেশ্য ছিল শত্রুপক্ষের রাডারে জাহাজের গতিবিধি ধরা না পড়া ও টর্পেডোর নিশানা থেকে রক্ষা পাওয়া। যুদ্ধের সময় মার্কিন নৌবাহিনীতে হয়েছে বহু গোপন এক্সপেরিমেন্ট। কিন্তু সকলকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল এই ডেস্ট্রয়ার শিপের ঘটনা, যার ফলা হয়েছিল মারাত্মক। এরই নাম দেওয়া হয় 'ফিলাডেলফিয়া এক্সপেরিমেন্ট'। এর আর-একটা নামও আছে, 'প্রোজেক্ট রেনবো'। এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার মূল ভিত্তি আইনস্টাইনের 'ইউনিফায়েড ফিল্ড থিয়োরি'। পদার্থবিদ্যার আর-এক জটিল পরীক্ষা 'অপটিক্যাল ইনভিজিবিলিটি'ও ছিল এই এক্সপেরিমেন্টের উদ্দেশ্য। এলড্রিজ সত্যিই কয়েক মুহূর্তের মধ্যে তিনটি বন্দর ঘুরে আবার ফিলাডেলফিয়ায় এসেছিল কি না, সে সম্পর্কে আজও চলছে নানা গবেষণা। ডঃ ফ্রাঙ্কলিন রেনো এই এক্সপেরিমেন্টের নেতৃত্ব দিলেও নেপথ্যে নাকি ছিলেন আইনস্টাইন। সেই সময়কার তদন্তকারী অফিসার মার্শাল বার্লেস লিখেছেন যে, আইনস্টাইনের 'ইউনিফায়েড ফিল্ড থিয়োরি ফর গ্র্যাভিটেশন অ্যান্ড ইলেকট্রিসিটি'র সাহায্যে সৃষ্টি করা হয়েছিল এক ধরনের 'ইলেকট্রনিক কামোফ্লেজ'। কোনও বস্তুর চারদিকে প্রচণ্ড শক্তির তড়িৎচৌম্বকক্ষেত্র সৃষ্টি করলে উত্তপ্ত ক্ষেত্রে আলোর প্রতিসরণে আপাতদৃষ্টিতে সেই বস্তুকে মনে হয় অদৃশ্য। এই এক্সপেরিমেন্টের ফল হয়েছিল মারাত্মক। জাহাজটিকে তড়িৎচৌম্বকক্ষেত্র থেকে মুক্ত করার পরই ভয়ংকর সব ঘটনা ঘটতে থাকে। যেমন, আগুন লেগে যাওয়া, স্ট্যাচুর মতো জমে যাওয়া, কিছু কর্মচারীর অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার মতো আশ্চর্য সব ব্যাপারস্যাপার! যেসব নাবিক বেঁচে ছিলেন, উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলেন তাঁরা।

বলা হয়, ১৯২৫ থেকে ১৯২৭ সালের মধ্যে একটি সায়েন্টিফিক জার্নালে নিজের এই বিতর্কিত থিয়োরি প্রথম প্রকাশ করেন আইনস্টাইন। কিন্তু রহস্য এখানেই যে, ওই থিয়োরি অসমাপ্ত থেকে যায়। কোনও রহস্যময় কারণে এ-ব্যাপারে তদন্ত বরাবরই থেকে গিয়েছে অসমাপ্ত।

এই রহস্যময় ঘটনাটি নিয়ে ১৯৮৪ সালে তৈরি করা হয় চলচ্চিত্র, 'দ্য ফিলাডেলফিয়া এক্সপেরিমেন্ট'। ১৯৯৬ সালে মার্কিন নৌবাহিনীর পক্ষ থেকে সরকারিভাবে প্রচার করা হয় একটি বিবৃতি—*ফিলাডেলফিয়া প্রজেক্টের কোনও অস্তিত্বই ছিল না। রেনবো নামে একটি প্রজেক্ট অবশ্য ছিল। তবে, তা ছিল ১৯৪৩ সালে ইতালি, জার্মানি ও জাপানকে পরাজিত করার যুদ্ধকালীন পরিকল্পনা। সেই সব কাজকর্মের সঙ্গে কোনওরকম যোগাযোগই ছিল না আইনস্টাইনের।*

আজও মার্কিন নৌবাহিনী অস্বীকার করে এলড্রিজ এক্সপেরিমেন্টের কথা। আইনস্টাইনও জীবদ্দশায় কোনওদিন স্বীকার করেননি প্রোজেক্ট রেনবোর অস্তিত্ব।

পাশের বাড়ির ছেলেটির আদলেই তৈরি পপ-আাই

পালংশাকই নাকি পপ-আইয়ের শক্তির উৎস। এলজি ক্রিসলার সেগারের সৃষ্ট জনপ্রিয় এই কার্টুন চরিত্রকে নিয়ে লিখেছেন অভিজিৎ সুকুল

অদ্ভুতদর্শন, বেঁটেখাটো চেহারা পপ-আই-এর। পপ-আই আসলে একজন নাবিক। পেশিবহুল হাতের নোঙরের চিহ্নই তাকে চিনিয়ে দেয়। এক চোখে দেখতে না পাওয়া পপ-আইয়ের মুখে সারাক্ষণ থাকে কর্ণকব পাইপ। পপ-আই হল বিখ্যাত কমিক-চরিত্র। পপ-আইকে নিয়ে তৈরি হয়েছে প্রচুর অ্যানিমেশন সিরিজ়ও। মজাদার কথা বলতে সে ওস্তাদ। কার্টুন সিরিজগুলোয় পপ-আইকে দেখা গিয়েছে পালংশাক চিবোতে। এটাই নাকি তার শক্তির উৎস। অ্যাডভেঞ্চারের নেশায় সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়ায় এই পপ-আই।

পপ-আইয়ের স্রষ্টারা: পপ-আইকে সৃষ্টি করেছিলেন এলজি ক্রিসলার সেগার। ১৯৩৮ সালে তিনি ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলে চার্লস এইচ 'ডক' উইনার এবং পরে সেগারের সহকারী বেলা জ্যাবোলি এবং ফরেস্ট 'বাড' স্যাগেনডর্ফ এই কমিক্সের দায়িত্ব নেন। ১৯৫৮ সাল থেকে পুরোপুরি দায়িত্ব নেন স্যাগেনডর্ফ। এ ছাড়াও জর্জ উইল্ডম্যান, ববি লন্ডন, হাই এইজম্যান—এই সব শিল্পীর নাম জড়িয়ে আছে পপ-আই চরিত্রটির সঙ্গে। ১৯৯৪ সালে স্যাগেনডর্ফ মারা যান। এখন নিয়মিত পপ-আইয়ের যে স্ট্রিপ বেরোয় তার বেশিরভাগই পুরনো।

পপ-আইয়ের শত্রুরা: ব্রুটোপিয়ার রাজা ব্লোজো (কোথাও বা এর নাম ব্রুটাস), অ্যালিস, বার্নার্ড, সি হ্যাগ, টোর—পপ-আইয়ের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে এদের নাম করা যায়।

পপ-আই স্ট্যাচু: এলজি সেগারের জন্মস্থান ইলিনয়েসের চেস্টার-এ সেগার মেমোরিয়াল পার্কে বেড়াতে গেলে দেখা যাবে পপ-আইয়ের ব্রোঞ্জ স্ট্যাচু। ৬ ফুট লম্বা এবং ৯০০ পাউন্ড ওজনের এই স্ট্যাচুটি ১৯৭৭ সালে তৈরি হয়েছিল। কোপেনহেগেনের বিখ্যাত 'দ্য লিট্‌ল মারমেড' স্ট্যাচুর মতো পপ-আইয়ের এই স্ট্যাচুটির উপরও বিভিন্ন সময়ে আক্রমণ চালিয়েছে দুষ্টু লোকেরা। এ ছাড়াও টেক্সাসের ক্রিস্টাল সিটিতে আছে পপ-আইয়ের আরও একটি স্ট্যাচু। সেখানকার পালংশাক চাষিরা পপ-আইয়ের পালংশাকপ্রীতির কথা ভেবে তৈরি করেছে তার স্ট্যাচু।

আরও পপ-আই: পপ-আই কমিক্সের অনেক চরিত্রই বাস্তব থেকে নেওয়া। চেস্টারে সেগারের বাড়ির পাশেই থাকতেন গাঁট্টাগোট্টা ফ্রাঙ্ক 'রকি' ফিজেল। এই ছেলেটির অনুকরণেই পপ-আই চরিত্রটি সৃষ্টি করেন সেগার। তেমনই চেস্টারের এক দোকানের মালকিনের আদলে গড়ে উঠেছিল অলিভ অয়েল চরিত্রটি। নাম, ডোরা পাস্কার। সেগারের পুরনো বস জে উইলিয়াম শুকার্টের অনুকরণে উইম্পি চরিত্রটির সৃষ্টি।

পপ-আইয়ের পেশিবহুল হাতের জন্য ডাক্তাররা অনেক সময় বাইসেপ্‌স পেশিকে 'পপ-আই মাস্‌ল' বলে অভিহিত করেন।

১৯৮০ সালে হলিউডে পপ-আইকে নিয়ে তৈরি হয়েছিল পূর্ণ দৈর্ঘ্যের এক চলচ্চিত্র। পপ-আইয়ের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন রবিন উইলিয়ামস। ১৯৯৫ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পপ-আইয়ের ছবি দেওয়া পোস্টাল স্ট্যাম্প বের হয়। ১৯৮২ সালে পপ-আইকে নিয়ে ভিডিও গেমও তৈরি করেছিল বিখ্যাত নিনতেনদো কোম্পানি।

সৃষ্টির নেপথ্যকাহিনি: সারা দুনিয়ায় এখন ভীষণ জনপ্রিয় হলেও পপ-আইয়ের শুরুটা হয়েছিল খুব সাদামাঠাভাবে। স্রষ্টা কার্টুনিস্ট এলজি সেগার কিং ফিচারের জন্য 'থিম্বল থিয়েটার' নামে একটি কমিক্স লিখতেন। এই কমিক্সের প্রধান দুই চরিত্রের নাম ছিল ক্যাস্টর অয়েল এবং হ্যাম গ্রেভি। একটি গল্পে এই দুই চরিত্র জাহাজে করে বিদেশযাত্রার মতলবে এসে হাজির হয় এক জাহাজঘাটায়। সেখানেই তাদের সঙ্গে দেখা হয় নাবিক পপ-আইয়ের। ১৯২৯ সালের ১৭ জানুয়ারি প্রকাশিত একটি কমিক্সে এভাবেই আবির্ভাব ঘটে পপ-আইয়ের। চরিত্রটি অল্প কিছুদিনের মধ্যেই এত জনপ্রিয় হয়ে যায় যে, হ্যাম গ্রেভির চরিত্রটিকে সরিয়ে তার জায়গা দখল করে নেয় পপ-আই। কমিক্স থেকে কার্টুনের দুনিয়ায় পপ-আই পা রাখে তিন বছর পর। ১৯৩২ সালে 'বেটি বুপ্‌ মিটস পপ আই দ্য সেলর' কার্টুনে প্রথম পপ-আইকে দেখা যায়। কমিক্স এবং কার্টুনের পপ-আইয়ের মধ্যে অবশ্য চরিত্রগত অনেক পার্থক্য রয়েছে।

পপ-আই কমিক্সের অন্য চরিত্ররা: ক্যাস্টর অয়েল ছাড়া পপ-আই কমিক্সের অন্যান্য চরিত্র হল অলিভ অয়েল (সে আবার পপ-আইয়ের বান্ধবীও বটে), উইমিপ, জর্জ গিজিল নামের এক জুতো সারাইওলা, পপ-আইয়ের বাবা পুপডেক প্যাপি, ইউজিন দ্য জিপ নামের অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন এক হলুদ কুকুর।

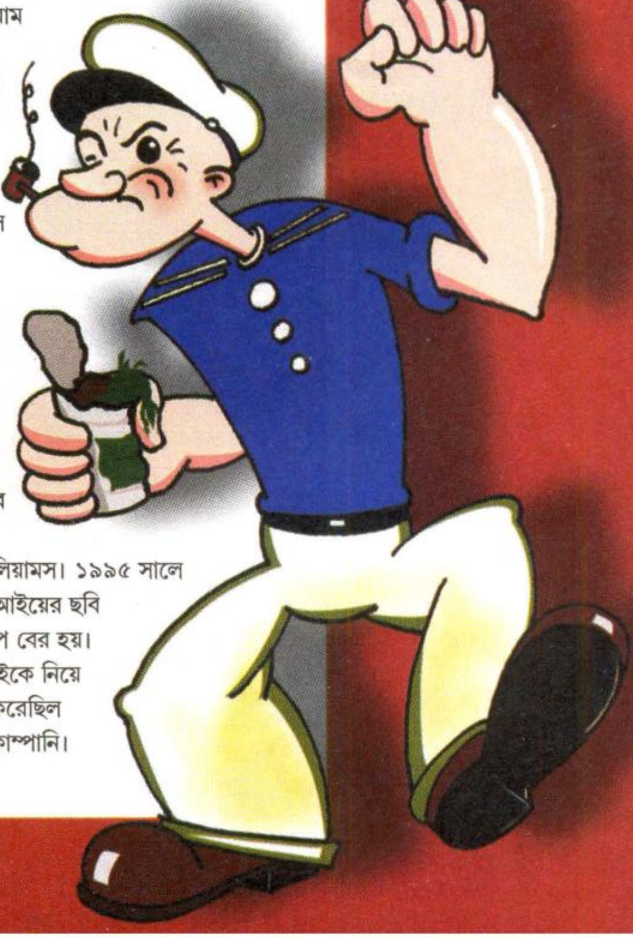

ছবি: সঞ্জীবন বসু

সতু সেনের কুঠিবাড়ি

শিবানন্দ পাল

অনেক রকম মানুষের অনেক রকম নেশা, পেশা, বাতিকের কথা শোনা যায়। কিন্তু আমাদের হরেনের নেশা একেবারে সৃষ্টিছাড়া। তার নেশা হচ্ছে নিজের অতীত খুঁজে বেড়ানো। যেখানে সে ডালপালা পাবে, সেখানেই দৌড়বে। এইভাবে কয়েকবার বিপদেও পড়েছে, কিন্তু তাতে একটুও দমেনি। কিছু বন্ধুবান্ধবও জুটিয়েছে এই কাজে, তারাও তাকে নাচিয়ে বেড়ায়।

তবে একটা কৌতূহল বটে! নিজের পূর্বপুরুষদের ভিটেমাটি খুঁজে বেড়ানো! সত্যি সেটা তার কোনও পূর্বপুরুষের ভিটে ছিল কি না, এ তর্কে না গিয়ে বলতে পারা যায়, সে এরকম বহু জায়গা ঘুরে-বেড়িয়ে এক রকমের আনন্দ পায়। এই আনন্দ ভয়াবহ।

হরেন একদিন খবর পেল, তার পূর্বের দ্বাদশ পুরুষ নাকি বর্ধমান, বীরভূম জেলার সীমান্তবর্তী অজয় নদের ধারে বর্ধমান জেলার বুধরা নামে একটা গ্রামে বসবাস করতেন। একাদশ পুরুষ পর্যন্ত সব ঘাঁটিগুলো তার ঘাঁটা হয়ে গিয়েছে। ঠিক এমন সময় হরেন তার দ্বাদশ পূর্বপুরুষের সন্ধান পেল। এই বিষয়ে কেউ যে তাকে বোকা বানাবে তার উপায় নেই। সে সব কিছু প্রমাণ নথিপত্রসহ লিখে রেখে দেয়। কোন পুরুষের ক'টি ছেলেমেয়ে ছিলেন, তাঁরা কোথায়-কোথায় ছড়িয়ে পড়েছিলেন, সব। নাড়িনক্ষত্র, নামধাম, গোত্র, বর্ণ পর্যন্ত লিখে রাখে। তাই এলেবেলে লোকরা হরেনকে ঘাঁটায় না। একবারে খাঁটি খবর না হলে চট করে তার সামনে কেউ প্রস্তাব পেশ করে না।

আপনারা প্রায় সবাই জায়গাটা খেয়াল করেছেন। হাওড়া থেকে শান্তিনিকেতন যাওয়ার পথে বর্ধমান ছাড়িয়ে যেই রেলগাড়িতে বীরভূমের সীমানায় ঢুকতে যাবেন, অনেকেই অজয় নদের উপর ব্রিজটা দেখেছেন। এখন কেবল বর্ষা ছাড়া সারা বছর অজয়ে জল থাকে না। অজয়ের সেই ব্রিজের উপর গাড়িটা যখন উঠবে, তার আগেই খেয়াল করবেন।

নদীর ঠিক পার ঘেঁষে ডান দিকে কয়েকটি পুরনো বাড়ির ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। বাড়িগুলোর খুবই ভগ্নদশা। সেই ভাঙা বাড়িতে এখন একটা প্রাথমিক বিদ্যালয় বসে। জঙ্গল পরিষ্কার হয়ে গাছপালাগুলো উধাও হয়ে গিয়েছে। জায়গার চেহারাটা এখন পালটে গিয়েছে। এক সময়ের এই লুপ রেললাইন এখন ডবল লাইন হয়েছে। ডবল লাইনের নতুন লাইনটা এখন পাতা হয়েছে ওই ভাঙাবাড়ির গা ঘেঁষেই। বাড়ির কিছুটা অংশ চাপা পড়ে গিয়েছে রেলের ডাঁই করা উঁচু জমিতে। সেখানে মাটি চাপা

পড়ে গিয়েছে একটা অতীত ইতিহাস। বাড়িটা ছিল হরেনের দ্বাদশ ঠাকুরদার। তাঁর নাম ছিল সতু সেন। তিনি দ্বিতীয়বার বিয়ে করেছিলেন। এটি ছিল তাঁর দ্বিতীয় বিবাহকেন্দ্রিক বাসস্থান। এক সময় এই তল্লাটের তিনি খুবই দাপুটে মানুষ ছিলেন। খুবই রমরমা ছিল তাঁর।

তা প্রায় তিরিশ বছর আগেকার কথা। তখন ওই জরাজীর্ণ দালান সাপখোপের আস্তানা আর জঙ্গলে ভরে ছিল। হরেনের কাছে খবর এল, ওই বাড়ি তার বংশের দ্বাদশ পূর্বপুরুষ তৈরি করেছিলেন। হরেন খবর নিতে শুরু করল। খবরটা সঠিকই পেয়েছে। হিসেবমতো বর্ধমান থেকে রেলগাড়িতে ভেদিয়া স্টেশনে নেমে সেখান থেকে একটা সাইকেলরিকশা ধরে চলে যাবে অজয়ের বাঁধের ধারে। কিন্তু খবরটা যে দিয়েছিল, সে পইপই করে নিষেধ করেছিল যে, "ভেদিয়া স্টেশনে কোনও ভ্যানরিকশায় খবরদার চাপবেন না। বিনে পয়সাতেও কেউ যদি নিয়ে যেতে চায়, তবুও না। আর, একা-একা সেখানে যাওয়া চলবে না।"

কিন্তু হরেন এর কোনও পরামর্শই শোনেনি। কাউকে নিয়ে যাওয়া মানে লোক জানাজানি হওয়া। এমনিতে ভেদিয়া স্টেশনে তখন সাইকেলরিকশা খুব একটা থাকত না। আশপাশের গাঁ থেকে বিশিষ্ট কেউ বা কোনও রুগিটুগি থাকলে গ্রাম থেকে কোনও ভ্যানরিকশা আসত। অপেক্ষা করত গ্রামের কেউ যদি নামে, তবে ভাড়া নিয়ে ফিরে যাবে বলে। ভাড়াও মিলত কদাচিৎ। ভ্যানরিকশাও ছিল মাত্র দু'-একটা। হাঁটাপথে এক ঘণ্টাও সময় লাগার কথা নয়। রেললাইন ধরে হাঁটলে সময় লাগার কথা এক ঘণ্টা, বোলপুর থেকে আরও কম। তবে ওই পথে রেলব্রিজ পার হওয়া বিপজ্জনক। ভেদিয়া দিয়ে যাওয়াটাই নিরাপদ। তবে এইটুকু পথ ভ্যানরিকশায় নিয়ে যাওয়ার জন্য রিকশাওলারা যা সব লোভ দেখায়, তার টান এড়িয়ে যাওয়া সহজ কাজ নয়। মাত্র দশ মিনিটে সেনমশাইয়ের দালানবাড়িতে পৌঁছে দেবে বলে তারা হলফ করে। শুধু কি তাই? সেনমশাইয়ের দালানবাড়িতে নিয়ে যাওয়ার পথে আরও দশটা আজব জিনিস তারা দেখাবে বলে ভরসা দেয়। আর সেইসঙ্গে প্রত্যেকেই জানায়, সেনমশাইয়ের বাড়ির পাতাল কুঠুরির হদিশ তারা জানে। বাবু যদি বাড়তি কিছু খরচা করেন, তা হলে সে নিশানাও তারা বাতলে দেবে।

হরেনের সংবাদদাতা এদের সম্বন্ধেই বিশেষভাবে সাবধান করে দিয়েছিল হরেনকে। বলেছিল, "কখনও ওদের বিশ্বাস করবেন না। ওরা প্রত্যেকেই এক-একটা ঠগ। ওই জঙ্গলে, বাড়ির ধ্বংসস্তূপে কোথায় কী পড়ে আছে কেউ জানে না। তেমন হলে ওই জঙ্গলেই...অথবা অজয়ের জলে...অথবা অজয়ের বালিতে...ওরা মানুষ মেরে পুঁতে রাখতে পারে। ওরা সেই ভল্লুপদ রাজার বংশধর। এক সময়ের ঠগ-ঠ্যাঙাড়ে, এই তল্লাটের ডাকাতগুলোর চেয়েও বিশ্বাসঘাতক শয়তান।

এই কড়া হুঁশিয়ারি থাকা সত্ত্বেও হরেন ভেদিয়া স্টেশনে নেমে ভ্যানরিকশার খোঁজ করল। কাউকে না দেখে উঁচু রেললাইন থেকে নেমে এল রাস্তায়। সংবাদদাতার কথাগুলো পুরোপুরি আজগুবি, একেবারে অবিশ্বাস করে হাঁটতে শুরু করেনি। শোনা কথাগুলোর মধ্যে সত্যের ছিটেফোঁটা কিছু আছে, কতটা সত্যি হতে পারে? এসব ভাবতে-ভাবতে সবে হাঁটা শুরু করবে, এমন সময় হঠাৎ পিছন থেকে ডাক শুনতে পেল।

"কর্তা, চলে যাচ্ছেন যে!"

হরেন চমকে বেশ একটু অবাক হয়েই পিছন ফিরল। দেখতে পেল, কালভার্টের নীচ থেকে একটা রিকশাওলা ডাকছে তাকে। অথচ একটু আগে ওদিকে সে কিছুই দেখতে পায়নি।

ফিরে দাঁড়াতে রিকশাওলা দু'বার প্যাঁক-প্যাঁক করে তার ভ্যানরিকশাটা হরেনের দিকে এগিয়ে নিয়ে এল। বলল, "আসুন কর্তা, সেনমশাইয়ের বাড়ি দেখতে যাবেন তো?"

তার এই প্রশ্নে হরেন অবশ্য অবাক হল না। রিকশায় উঠে জিজ্ঞেস করল, "কোথায় যাব, তুমি জানলে কী করে?"

"তা আর জানব না কর্তা? সেনমশাইয়ের দালানবাড়ি দেখতে আসা ছাড়া আপনার মতো মানুষ এই তল্লাটে আসবেন কেন? কেউ-কেউ অবশ্য ভুল করে পাণ্ডুরাজাদের টিপি দেখতে এখানে নামে।"

হরেন মনে-মনে চমকালেও বাইরে কিছু বুঝতে না দিয়ে জিজ্ঞেস করল, "সেনমশাইয়ের বাড়ি তো বললে। তাঁর সম্পর্কে আর কিছু কি জানো?"

"তা আর জানি না কর্তা!" ভ্যানরিকশাওলা হেসে বলে, "এই তল্লাটে তো ওই একটাই দালানবাড়ি। আর কোনও বাড়ি আছে নাকি?"

হরেনের মাথায় তখন অনেক গোলমেলে ভাবনা শুরু হয়ে গিয়েছে। সেই ভাবনাগুলো মনেই চেপে রেখে জিজ্ঞেস করল, "সেনমশাইয়ের বাড়ি কোন পথে যেতে হবে ঠিক জানো তো?"

"বিলক্ষণ।" ভ্যানরিকশাওয়ালা ভ্যানটা সামনের দিকে চালিয়ে দিয়ে বলল, "সেনমশাইকে চোখেও দেখেছি আমি।"

বলে কী লোকটা! সেনমশাই অন্তত দেড়শো-দু'শো বছর আগেকার মানুষ। তাঁকে চোখে দেখার দাবি করছে ভ্যানরিকশাওলা। হরেন ভাবে, বেশ রগুড়ে মানুষ তো! কিন্তু... মনের মধ্যে সব প্রশ্ন হাল্কা করার চেষ্টা করল সে।

হাসিমুখে বলল, "সেনমশাইকে চোখে দেখেছ? তুমি তো তা হলে যে-সে মানুষ নও গো! তা তোমার নাম কী?"

"নাম?" ভ্যানরিকশাওলা নাম জিজ্ঞেস করতে একটু যেন অবাক হল! বলল, "কর্তা, নাম আমার তারাপদ । তা সবাই 'তারা' বলে ডাকে।"

"নাম তোমার তারাপদ?" বিস্ময় আর কৌতূহলটা গলার স্বরে লুকোতে পারে না হরেন।

ভ্যানরিকশাওলা সেটা লক্ষ না করেই বলল, "হ্যাঁ কর্তা, আমার নাম তারাপদ সেন।"

তারাপদ সেন! অবাক হয়ে হরেন ভাবল, তা হলে কি ওই সেনবাড়িরই কেউ? অত কষ্ট করে যে এসেছে, তারই কি সন্ধান পেল সে? সেই দুরন্ত ভয়ংকর নীলকুঠি ম্যানেজারের রক্ত বইছে, এমন কেউ কি এই তারাপদ? প্রথম থেকেই লোকটার চেহারাটা একটু বেয়াড়া লাগছিল? ভ্যানরিকশা পাওয়ার ব্যাপারটাই বেশি মনোযোগ কেড়ে রাখায় অন্য সব ভাবনা তখনকার মতো চাপা পড়ে গিয়েছিল। এখন তারাপদ সেন নামটা তার মনটাকে সজাগ করে তুলল। হ্যাঁ, চেহারাটা একটু বেখাপ্পা লাগছিল। ফরসা ঠিক নয়, গায়ের রং একটু হাল্কা তামাটে। লম্বাটে পাকানো চেহারায় শুকনো মুখের উপর ঝাঁকড়া চুলগুলো কেমন যেন বেয়াড়া ধরনের। ডাকাত-ডাকাত লাগে।

মনে-মনে হরেন তখন বুঝে নিয়েছে যে, মানুষটা সেই দেড়শো-দু'শো বছর আগেকার সেনমশাইয়েরই কোনও বংশধর না হয়ে যায় না। এই বাংলায় চষে বেড়ানো হিংস্র সেই নীলকুঠি সাহেবরা কবে কোথায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তাদের ক'ফোঁটা রক্ত এখনও যেন ধোয়ামোছা হয়ে যায়নি। পড়ে আছে এখানে-সেখানে।

কিন্তু এই মানুষ আর তার ভ্যানরিকশাটাকে প্রথমে কেন দেখতে পায়নি? খুব তাড়াহুড়োয় যেমন-তেমন করে তো দ্যাখেনি। বেশ ভাল করেই লক্ষ করেছিল সে।

মনের ধোঁকার কথাটা এবার মুখেই প্রকাশ করল সে। জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, তোমায় প্রথমে দেখতে পাইনি কেন বলো তো? তুমি তো এখানেই ছিলে?"

"তা ছিলাম বইকি কর্তা," তারাপদ ধাঁধার মতো করে জবাব দিল, "তবে দেখা দিতে না চাইলে দেখবেন কী করে?"

তারাপদর একটু মজা করে কথা বলার স্বভাব আগেই টের পেয়ে গিয়েছে হরেন। তারই সঙ্গে সুর মিলিয়ে তাই বলল, "তা হলে শেষ পর্যন্ত দেখা দিলে কেন? আমাকে পছন্দ হল বলে?"

"তা, একটু হল বইকি কর্তা। নইলে আমার ভ্যানরিকশায় আপনাকে সওয়ারি করলাম কেন?" বলল তারাপদ।

"তা, হঠাৎ আমাকে পছন্দ করার কারণটা একটু বলবে কি?" হাল্কা সুরে হলেও সত্যিকারের কৌতূহল নিয়েই হরেন জানতে চাইল।

তারাপদ এবার যে কথাটা বলল, তাতে হরেন একটু ঘাবড়ে গেল।

"পছন্দ হল কেন, তা জানতে চান?" তারাপদর বাচনভঙ্গি কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেল। সে বলল, "আপনাকে পছন্দ হল নির্ঝঞ্ঝাট সওয়ারি বলে।"

"নির্ঝঞ্ঝাট সওয়ারি? তার মানে? কী বলতে চাইছ তুমি?" তারাপদর কথা সত্যিই হরেন বুঝতে পারে না।

তারাপদ তখন বলল, "নির্ঝঞ্ঝাট সওয়ারির মানে বুঝতে পারলেন না? মানে হচ্ছে, শাবল, কোদাল, গাঁইতি নিয়ে আপনি আসেননি। গজ-ফিতে, বন্দুকটন্দুক, নেহাত সড়কি-বল্লম, তা-ও নিয়ে আসেননি। এসেছেন একেবারে ঝাড়া হাত-পা নিয়ে। তাই বলছিলাম নির্ঝঞ্ঝাট সওয়ারি।"

"তা হলে তুমি যেরকম বললে, ওই রকম লটবহর নিয়ে এদিকে কেউ-কেউ আসে বলছ?"একটু বোকার মতো জানতে চাইল হরেন।

"কেউ-কেউ কী বলছেন কর্তা! প্রায় সবাই এভাবেই আসে। তাতেই তো বাড়িটার দফা গয়া হয়ে যাচ্ছে। আর, আসবে না-ই বা কেন? তারা সবাই শুনেছে সেনমশাইয়ের নীলকুঠিতে যখের ধন আছে। তাই তারা লোকলশকর নিয়ে আসে। এক দিন, দু' দিন নয়। দিনের পর-দিন খোঁড়াখুঁড়ি করে। ওই বাড়ির দেওয়াল, মেঝে খোঁজাখুঁজি করে গর্ত করে জান কয়লা করে ফ্যালে। শেষে যখন কিছুই মেলে না, তখন সেনমশাইকে গালমন্দ করে বিরক্ত হয়ে চলে যায়।"

"সেনমশাইয়ের কুঠিবাড়ি এটা নয় তা হলে? কুঠিবাড়িতে আসলে কিছুই নেই তা হলে?" হরেন এবার আসল কথাটাই জানতে চায়।

"আছে বইকি কর্তা।" তারাপদ যেন একটু জাঁক করেই বলে। এটা সেনমশাইয়েরই কুঠি। আর, এই বাড়িতেই সেনমশাইয়ের গুপ্তধন আছে।"

তারাপদকে একটু তোয়াজ করার গোপন ইচ্ছেয় হরেন বলল, "তা, তুমি নিশ্চয়ই সেই যখের ধনের সন্ধান জানো?"

"আমি ছাড়া আর কে জানবে?" তারাপদ যেন বুক চিতিয়ে বলল, "ওই যখের ধনের আমিই তো পাহারাদার।"

"পাহারাদার? বাঃ, বেশ তো!" হরেনের গলার আওয়াজে উপহাসটুকু

লুকিয়ে রইল না। সে এবার বলল, "তা সেই যখের ধন কোথায় আছে, জায়গাটা আমাকে একবার দেখাতে পার? না, না। তোমার ভয় নেই। শাবল, কোদাল নিয়ে এসে আমি খোঁড়াখুঁড়ি করব না কথা দিচ্ছি। শুধু জায়গাটা দেখিয়ে দাও।"

হরেনের আশ্বাস পেয়ে তারাপদ কীরকম অদ্ভুত গলায় বলল, "শুধু জায়গাটা দেখতে চান? বেশ, তা হলে দেখেই রাখুন। আপনি যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন কর্তা, সেনমশাইয়ের যখের ধন আছে ঠিক তারই নীচে।"

"কী!" প্রায় অস্ফুটে চিৎকার করে লাফিয়ে উঠল হরেন। প্রথমে নীচের দিকে, তারপর চারপাশে তাকিয়ে বুকটা হঠাৎ যেন কেমন হিম হয়ে গেল তার! ঠিক তখনই একটা স্টিম ইঞ্জিনচালিত এক্সপ্রেস ট্রেন দুরন্ত গতিতে পাশের রেললাইন দিয়ে চলে না গেলে সে হয়তো মূর্ছাই যেত।

এ কোথায় সে এসেছে! একেবারে অজয়ের ধারে ঝোপ-জঙ্গলে ঢাকা একটা বাড়ির ধ্বংসাবশেষ। বহু পুরনো কালের বাড়ি। বাড়ির চেহারা যেন আরও ভয়ংকর করে তোলার জন্যই এখানে-সেখানে আশশ্যাওড়া, বট, নিম আর আকন্দ গাছের বিরাট-বিরাট সব ঝোপ গজিয়ে উঠেছে।

এ কোন জায়গা? সরু মেঠো রাস্তা দিয়ে তারাপদর সঙ্গে কথা বলতে-বলতে কখন সে এই জঙ্গল আর ধ্বংসচিহ্নের মধ্যে ঢুকে পড়েছে, খেয়ালই করেনি। অবাক হয় হরেন।

কিন্তু যার ভ্যানরিকশায় চড়ে এসে এখানে পৌঁছেছে, সেই তারাপদ কোথায় গেল? চারপাশে ভাঙা দেওয়াল-দালানের ভগ্নাবশেষ। হরেন যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, সেটা বোধ হয় কোনও ঘর ছিল। মেঝের উপর দাঁড়িয়ে আছে হরেন। কিন্তু তারাপদকে কোথাও দেখতে পেল না।

চারপাশে হঠাৎ একটা বিশ্রী আওয়াজ উঠল। আচমকা একটা ঘূর্ণি হাওয়া যেন তাকে ঝাপটা মেরে গেল। এ শব্দটা কি তারই? বিদ্‌ঘুটে একটা অট্টহাসির মতো শোনা গেল। গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল হরেনের।

আশপাশের ঝোপগুলো তখন ভয়ংকরভাবে দুলছে। কিছু যেন বেরিয়ে আসবে তা থেকে। দাঁতে-দাঁত চেপে জোর করে মনটাকে শক্ত করে হরেন দাঁড়িয়ে রইল। দেখতে থাকল চারপাশ। হার মানবে না কিছুতেই। দেখবে সে, শেষ পর্যন্ত আর কী কী ঘটে!

দেখল, ভাঙা বাড়ির ইটের পাঁজর থেকে তারাপদ বের হয়ে তার সামনে এল। তার হাঁটুর উপর তোলা আঁটসাঁট করে মালকোঁচা মারা খাটো কাপড়ের গোঁজ থেকে বের করল একটা জিনিস। হরেন বিস্ময়ে দেখল, তারাপদর হাতে চামড়ার নকশা তোলা খাপে ভরা সেকেলে একটা ছোরা।

তারাপদ তার সবুজ ছিটে দেওয়া চোখে তার দিকে এমনভাবে তাকাচ্ছে, তাতে তার এখান থেকে দৌড়ে পালানোর ইচ্ছে যে করেনি এমন নয়। কিন্তু নিজেকে একটু সামলে নিয়ে মুখে কৌতুকের হাসি ফুটিয়ে সে জিজ্ঞেস করল, "শুধু একটা ছোরা নিয়ে এলে? আর কিছু পেলে না?"

"আরও একটা জিনিস এনেছি কর্তা। আগে এটা দেখুন।" একটু যেন গম্ভীর স্বরে বলল তারাপদ। তারপর খাপ থেকে ছোরাটা বের করল।

শিউরে-ওঠা ভয়ে চমকে উঠল হরেন। ছোরার চকচকে ইস্পাতের পাতটা যেন হিংস্র জীবন্ত কোনও প্রাণীর মতোই লকলক করে উঠল।

"এ বড় বেয়াড়া জিনিস কর্তা। কত জনের জান নিয়েছে তার হিসেব নেই। একবার হাতে নিলেই হাত কেমন যেন নিশপিশ করে ওঠে চালানোর জন্য। ধরে একবার দেখবেন না কি? এই নিন।"

তারাপদ খোলা ছোরাটা হরেনের দিকে বাড়িয়ে দিচ্ছিল। আপত্তি জানিয়ে হরেন বলল, "না, না। হাত নিশপিশ করার লোভ আমার নেই। ও জিনিস তোমার হাতেই থাক।"

"তা হলে আপনি এই জিনিসটা দেখুন," বলে তারাপদ যেটা ছুড়ে দিল, সেটা কোনওরকমে লুফে নিল হরেন। মুঠো খুলে দ্যাখে, সেটা একটা ভারী কয়েন। পঞ্চম জর্জের মাথার ছাপ রয়েছে তাতে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নাম লেখা। সোনার টাকা বলেই মনে হচ্ছে।

কৌতূহল থাকলেও সেটা ফেরত দেওয়ার জন্য হাত বাড়িয়ে শুধু বলল, "এটা তো সোনার টাকা বলেই মনে হচ্ছে। এখন তো এর অনেক দাম।"

"হ্যাঁ, কর্তা। আহা, ওটা ফেরত দিচ্ছেন কেন? ওটা আপনার কাছেই রাখুন। আপনাকেই দিলাম।"

"না," একটু হেসেই বলল হরেন। কে জানে কত রক্ত লেগে আছে ওই টাকায়! ওতে আমার লোভ নেই কোনও।"

"লোভ নেই?" তারাপদ একটু অদ্ভুতভাবে তাকাল হরেনের দিকে। তা হলে এসেছেন কিসের জন্য?"

"এসেছি শুধু জায়গাটা দেখতে।"

"শুধু দেখতে? এখন শুধু দেখে যাবেন। তারপর আসবেন লোকলশকর নিয়ে?"

"সে ভয় করার তোমার কোনও কারণ নেই। অমন দু'-দশ ঘড়া টাকায় আমার লোভ নেই। আমি শুধু জানতে চাই, সেনমশাইয়ের এই কুঠি ধ্বংস হল কী করে?"

"সে আর কী বলব কর্তা, অজয়-এ সেবার ভীষণ বান হয়েছিল। এ-তল্লাটের যা কিছু ছিল, সব ভাসিয়ে দিয়েছিল।"

"তুমি কি তা হলে সেই বাংলা বারোশো তেত্রিশের বানের কথা বলছ?"

"বারোশো তেত্রিশ কী বলছেন কর্তা? আমি বলছি তারও আগের কথা। আসলে এই কুঠি বানিয়েছিল এক ফিরিঙ্গিসাহেব। সে ছিল ভয়ানক সাহেব। এই তল্লাটে নীলের চাষ করাত। শুধু নীল চাষে কত পয়সা হয়! আর নীল চাষে ঝকমারিও অনেক। তার ছিল ডাকাতের দল। আশপাশের বহু জমিদারবাড়ি তার দৌলতে লুটেপুটে ছারখার হয়েছিল। সেই ধনসম্পদ এনে জড়ো করার জন্যই এই কুঠি তৈরি করা হয়েছিল। এই কুঠি তারা পাহারা দিত। এখান থেকেই তারা হানা দিতে বের হত, আর ধনসম্পদ এনে জড়ো করত। নদীপথেও চলে যেত দূরে কোথাও। আর, নদীপথে কেউ যদি বজরা নিয়ে যেত, তা হলে তাকে আর ঘরে ফিরতে হত না। নদীর ধারে জঙ্গলের মধ্যে এই কুঠির সন্ধান কেউ জানতে পারত না। আপনি যে সেনমশাইয়ের কথা বলছেন, তিনি হলেন সতু সেন, আমার বাবা, ওই ফিরিঙ্গিসাহেবের কাছেই কাজ করতেন।

"লুট করা ধনদৌলত যখন অনেক জমে উঠেছে, তখন এই দেশের রেওয়াজ মাফিক সতু সেন সাহেবকে বুদ্ধি দেন, বাড়ির কোথাও একটা গোপন

পাতালকুঠুরি করে সেখানে লুঠ করা সমস্ত ধনদৌলত লুকিয়ে রাখতে। ফিরিঙ্গিসাহেব রাজি হয়ে যায়। কিন্তু সাহেব যে কী শয়তানি মতলব এঁটেছে, তা সতু সেন আঁচ করতে পারেননি। ফিরিঙ্গিসাহেবের পরিবার থাকে ইংল্যান্ডে। সাহেবের ইচ্ছে ছিল এই ধনসম্পদ সব নিয়ে যাবে তার দেশে। কিন্তু যাওয়ার তখনও দেরি আছে। ধনসম্পদ যাতে ভাল করে লুকিয়ে রাখা যায়, তার জন্য গুপ্ত কুঠুরি তৈরি করা হয়। এই গুপ্তধন যাতে নিপাত্তা না হয়ে যায়, তাই গুপ্ত কুঠুরিটা দেখিয়ে রাখার জন্য সাহেব সতু সেনকে বলল তাঁর ছেলেকেও সঙ্গে রাখার কথা। কোনও রকম সন্দেহ না করে সতু সেন রাজি হন।

"তারপর ফিরিঙ্গিসাহেব অতি সহজেই তার মতলব হাসিলের ব্যবস্থা করে। গুপ্তধনকে যখের ধন করে তোলার জন্য তা আগলাতে সতু সেনের ছেলেকে জোর করে ধরে পাতালকুঠুরির গহ্বরে ঠেলে নামিয়ে দিয়ে গহ্বরের মুখটা ভারী পাথর দিয়ে এঁটে দেয়। সতু সেনকে খুন হতে দেখে তাঁর ছেলে খুব চেষ্টা করে সাহেবের কবল থেকে ছাড়া পাওয়ার। কিন্তু আট-দশ বছরের মা-মরা একরত্তি ছেলেটা পারবে কেন ওরকম একটা দৈত্যের সঙ্গে! ফিরিঙ্গিসাহেব তাকে দলা পাকিয়ে পাতালকুঠুরির গহ্বরের ভিতর ফেলে দিয়ে দেড়মনি একটা পাথর চাপা দেওয়ার আগে বলেছিল, 'খুব ভাল করে পাহারা দিবি। আমি বা আমার বংশের কেউ যদি আসে, তখন তার হাতে তুলে দিবি এই ধন।'

"তা, সতু সেনের ছেলে সেকথা রেখেছে এখনও পর্যন্ত। অবশ্য ভাগ্য তাকে সাহায্য করেছে। পাতালকুঠুরিতে বন্ধ করার পরের দিনই অজয়ের বাঁধ ভেঙে গিয়েছিল। আর, তখন ছিল বর্ষাকাল। অজয় ছিল জলে টইটুম্বুর। চারদিক বন্যায় ভাসছে। বাঁধ ভেঙে জলের স্রোতের মেঘছোঁয়া ঢেউ এসে সব ভাসিয়ে লন্ডভন্ড করে দিয়েছিল।

"ফিরিঙ্গিসাহেবের পাতালকুঠুরির উপরের সেই জলের ধাক্কায় এমন কিছু না নড়লেও নীচের দিকের গাঁথুনি আছড়ে পড়া জলের ঢেউয়ের তোড়ে আলগা হয়ে যায়। ধসে পড়া সেই দেওয়ালের ফাটল বেয়ে বেরিয়ে আসে সতু সেনের ছেলে। কোনওমতে তার প্রাণটুকু তখন ঠোঁটের ডগায় আটকে আছে। জল আস্তে-আস্তে কমলে সে একটা গাছের ডালে লটকে থাকা বাবার মৃতদেহ থেকে খুলে নেয় খাপসমেত ছোরাটা। তারপর থেকে এই ভাঙা বাড়িতেই সে থেকে যায়।

"বদলা নেওয়ার জন্য খুব বেশি দিন তাকে অপেক্ষা করতে হয়নি। ফিরিঙ্গিসাহেব বন্যার ঢেউয়ে নাকানিচোবানি খেতে-খেতে আছড়ে গিয়ে পড়েছিল অনেক দূরের এক ডাঙায়। কিন্তু প্রাণে মারা যায়নি। কিছুদিন পরে সুস্থ হয়ে সে-ও তার যখের ধনের পাতালকুঠুরির সন্ধানে ফিরে আসে।

"তবে খোঁজ তাকে পেতে হয়নি। ভাঙা বাড়িতে সতু সেনের ছেলে সুযোগের অপেক্ষায় দিন গুনছিল। এক মুহূর্ত দেরি করেনি সে। খাপ থেকে লকলকে ছোরাটা বের করে নির্ভুল নিশানায় ছুড়ে দেয় ফিরিঙ্গিসাহেবের দিকে। ছোরাটা বুকে না বিঁধলেও তার হাতল অবধি গেঁথে যায় সাহেবের উরুদেশে। সাহেব তখন তার গাদা বন্দুকটা ছুড়েছে সতু সেনের ছেলের দিকে। কিন্তু ফল কী হয়েছে তার জন্য অপেক্ষা করতে পারেনি। ফিনকি দিয়ে ওঠা রক্তে ভিজে গিয়েছে তার শরীর। দেখতে-দেখতে শরীর অবশ হয়ে গিয়েছে। হাতে বন্দুকটা ধরে রাখার ক্ষমতাও নেই। কোনও রকমে ঘষটে-ঘষটে নিজের দেহটা নিয়ে সে তখন আশ্রয় নিয়েছে একটা ঝোপের আড়ালে।

"একটা পা তার বরবাদ হয়েছে বটে, কিন্তু প্রাণে সে মরেনি। ঘা শুকোবার পর গুপ্তধনের সন্ধানে সে হামেশাই হামলা চালায়। ওই দেখুন, সে আবার এসেছে...।"

তারাপদ যেদিকে আঙুল বাড়িয়েছে, সেদিকে মুখ ফিরিয়ে হরেন শিউরে ওঠে। সত্যিই একটা দৈত্যাকার মানুষ ল্যাংচাতে-ল্যাংচাতে ওদের দিকে ধেয়ে আসছে। তার ভয়ংকর হিংস্র চেহারায় ওভাবে ছুটে আসায় আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হল। ল্যাংচাতে-ল্যাংচাতে কোনও রকমে ওদের দিকে সাহেব কিছুটা এগিয়ে এসে কাঁধের গাদা বন্দুকটা উঁচিয়ে ধরল।

হরেন ভয়ে শিউরে উঠে কোথায় লুকোবে বুঝতে পারে না। ভয়ের কাঁপুনিটা শুরু হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে সে

তারাপদর গলা শুনতে পেল।

"ভয় পাবেন না কর্তা। আমার মতো দোভাঁজ চোখ ওই সাহেবের নেই। ও শুধু আমাকেই দেখতে পাচ্ছে, আপনাকে নয়।"

কথাটার মানে বুঝতে পারল না হরেন। সে দেখল, ততক্ষণে তারাপদ এক ঝটকায় খাপ থেকে ছোরাটা বের করে ছুড়ে দিয়েছে সাহেবের দিকে। সাহেবের গাদা বন্দুকও সেই মুহূর্তে গর্জে উঠেছে। তারাপদর ছোরাটা তার উরুতে গেঁথে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে তারাপদও গুলিলাগা রক্তমুখে ছিটকে পড়ল।

কয়েক মুহূর্তের জন্য মাথাটা ঘুরে গিয়েছিল হরেনের। সে চোখে অন্ধকার দ্যাখে। তারপর একটু সামলে উঠে দ্যাখে, চারদিকের অন্ধকার পরিবেশের মধ্যে সে একা পড়ে আছে।

হঠাৎ চমকে উঠে দেখল, সে আর একা নেই। রিকশার সামনে দাঁড়িয়ে আছে তারাপদ। বলল, "কী হল কর্তা, ফিরে যাবেন?"

ভিতরের উদ্বেগটা সম্পূর্ণ লুকোতে না পেরে হরেন বলে উঠল, "হ্যাঁ, খুব তাড়াতাড়ি চল।"

বিষণ্ণ গলায় তারাপদ বলল, "বেশ, চলুন তা হলে।"

রিকশা এগিয়ে চলে। হরেন বুঝতে পারে না, রিকশা কীভাবে চলছে। সে বোঝার চেষ্টাও করে না। রিকশা চললেই হল। দু'ধারের ঝোপঝাড় ছাড়িয়ে এগিয়ে চলে রিকশা। হঠাৎ সেটা কিছু দূর এগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। অবাক হয়ে হরেন জিজ্ঞেস করল, "কী হল কী, থামালে কেন?"

"আপনার যাওয়া হবে না কর্তা।"

"যাওয়া হবে না মানে?" ভয়, উদ্বেগ, রাগ— কোনওটাই আর হরেনের গলার স্বরে লুকিয়ে রইল না। সে চিৎকার করে বলল, "কী বলছ কী তুমি?"

"আজ্ঞে, আমার কথাটা একটু মন দিয়ে শুনুন কর্তা।" তারাপদর গলায় করুণ মিনতি ঝরে পড়ল। "কী দরকার কর্তা আপনার ফিরে যাওয়ার? থেকে যান এখানে। আপনাকে সত্যি কথাই বলছি। ঢের-ঢের সওয়ারি আমি নিয়ে এসেছি এখানে। আসল যখের ধনের নমুনা তুলে এনে তাদের দেখিয়েছি। তারপর সেই আদ্যিকালের পালা যখন তাদের সামনে মেলে ধরেছি, হাতের মুঠোয় ধরা সোনার টাকা, তারা ছাড়েনি। ভয়ে কাঠ হয়ে প্রাণ বাঁচাতে পালাতে চেয়েছে এখান থেকে আর মরেছে। তাতে বদনাম হয়েছে আমার। আমিই যেন তাদের মেরেছি, পাতালকুঠুরি দেখানোর লোভ দেখিয়ে। আমি তাদের মারিনি কর্তা, তারা নিজেরাই মরেছে। এদের সকলের চেয়ে আপনি আলাদা। কোথায় ফিরে যাবেন? কোন দুঃখে যাবেন? এখানে আপনাকে বাদশা করে রাখব। কর্তা, আপনি থেকে যান এখানে। এই কুঠি, এই ঝোপঝাড়, এমন আজব মঞ্জিল আপনাকে দেব। দু'শো বছরের ওরকম ১০ হাজার কিস্‌সার পালা সাজিয়ে আপনাকে দেখাব। না কর্তা, ফিরে যাওয়া আপনার হবে না। আপনার মতো মানুষকে পেয়ে আমি আর ছাড়ব না।"

সে বুকের ভিতরের কাঁপুনিটা যথাসম্ভব গোপন করে খুশি-খুশি মুখে বলল, "তা মন্দ বলোনি কথাটা। আমার ফিরে যাওয়ার কোনও মানেই হয় না। ফিরে আমি যেতেও চাই না। কিন্তু..."

"কী কিন্তু? কোনও কিন্তু নেই," তারাপদ তার কথায় ব্যস্ত হয়ে উঠল।

"না, বলছিলাম কী..."

"কী, বলুন না কর্তা?"

হরেন তখন মনের মধ্যে অনেক কিছু ভাবছে। একটু চুপ করে থেকে বলল, "তুমি তো সতু সেনের ছেলে বললে।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, কর্তা," গর্বের সঙ্গেই বলল তারাপদ।

"তখন তোমার আট-দশ বছর বয়স ছিল। তার মানে নেহাতই ছোট ছিলে," হরেন যেন দরদ দেখিয়ে বলে, "দুনিয়ার সব হালচাল তখনও তুমি জানতে পারনি।"

"না, কর্তা," তারাপদ যেন প্রতিবাদ করে। সে বলে, "নেহাত ছোট নয় কর্তা। যখ হওয়ার সময় তেমন লায়েক না হলেও শয়তান সাহেবটাকে ছোরা গেঁথে খোঁড়া করার পরও সে যেমন অনেক দিন বেঁচে ছিল, তেমনই আমিও তার বন্দুকের গুলিতে ঝাঁঝরা হলেও টেঁসে যাইনি।"

"হ্যাঁ," সায় দিয়েই হরেন বলে, "গুলিতে যে তুমি টেঁসে যাওনি, তা তো তোমার এখনকার চেহারা দেখেই বুঝতে পারছি। কিন্তু আইনকানুনের বেড়াজালের কথা তো তুমি শোনোনি। আদালতে হাজিরা দেওয়ার শমন জারির হুলিয়ার কথা শুনেছ কি?"

"না, তা শুনিনি। তবে, সেই হুলিয়া না কী বলছেন, সেসব কি এখান পর্যন্ত এসে পৌঁছবে?"

"মানুষ মারার হুলিয়া কী বলছ তুমি? সমাধি থেকে টেনে বের করবে।"

"বের করবে বুঝি?" তারাপদর ভ্যাবাচ্যাকা মুখের জিজ্ঞাসার জবাবে মুখটা যথাসম্ভব থমথমে করে হরেন বলল, "আমার ঝামেলা ওখানেই।"

"কীরকম?"

"ঠিক দিনের দিন আদালতে হাজিরা না দিলে শমন হুলিয়া হয়ে খুঁজে বেড়াবে। আর এই মামলার সাক্ষি দিতে যাওয়ার জন্যই তো আমার এখানে আসা। শমন এলে কেউ ঠেকাতে পারবে না। তার চেয়ে মামলার সাক্ষীর জবানবন্দিটা দিয়ে আসাই ভাল।"

"বলছেন? কিন্তু সাক্ষি দিয়ে আপনি..." একটু সন্দেহের স্বরেই জিজ্ঞেস করে তারাপদ, "ঠিক ফিরে আসবেন তো?"

"বাঃ, এত ধনদৌলত ফেলে আসব না তো যাব কোথায়?" গলায় জোর এনে হরেন বলে, "আর, না এলে তো তুমিই টেনে আনবে গিয়ে।"

"না, না," তারাপদ যেন ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেল। বলল, "আপনাদের ওই মানুষ গিজগিজে শহরে যাওয়ার ক্ষমতা আমার নেই। এখানেই আমার অবস্থা সঙিন হয়ে উঠেছে। গ্রামের লোকরা এই বাড়িঘরের ইট, কাঠ সব খুলে-খুলে নিয়ে চলে যাচ্ছে। ভয় দেখালেও ভয় পায় না।"

"তাই নাকি?" আহ্লাদে আটখানা হওয়ার ঢেউটা গলা পর্যন্ত ওঠার আগেই তাকে বুকের মধ্যে চেপে বসিয়ে দেয় হরেন। বলে, "বেশ, তোমাকে যেতে হবে না। আমি কথা দিচ্ছি ফিরে আসব। এখন একটু তাড়াতাড়ি আমাকে স্টেশনে পৌঁছে দাও দিকি।"

তারাপদ তাই দিয়েছিল। এখনও পর্যন্ত সে হরেনের পিছু ধাওয়া করেনি। তবে, হরেন কোনওদিন ট্রেনে চেপে শান্তিনিকেতন অথবা দার্জিলিং যাওয়ার নামটুকু করে না। যেতে হলে সে ঘুরে যায়, ঘুরপথে সড়ক দিয়ে।

ছবি: সঞ্জীবন বসু

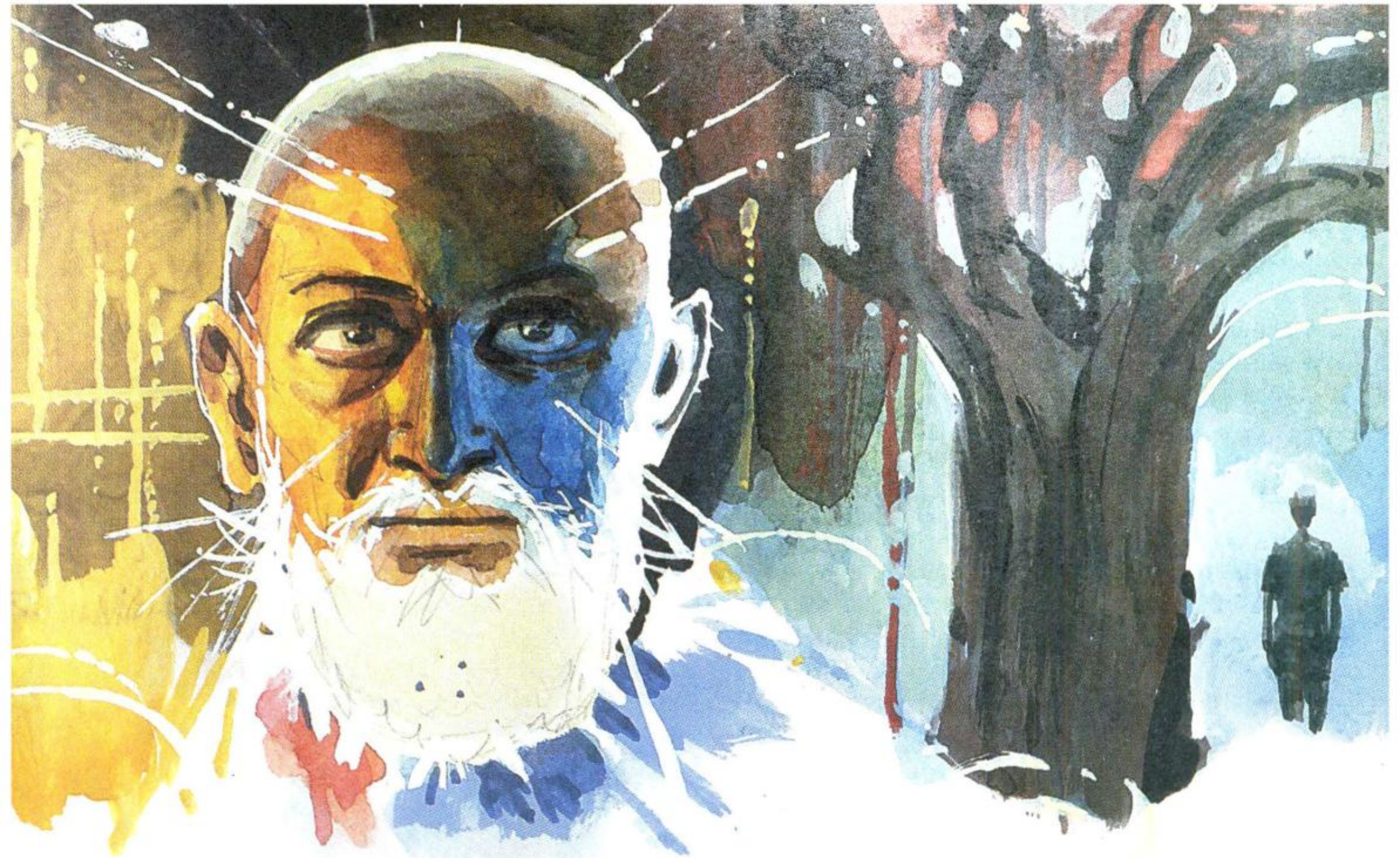

ভবিষ্যতের দেশে

অরবিন্দ ভট্টাচার্য

সেদিন কী একটা কারণে চার পিরিয়ডের পর স্কুল ছুটি হয়ে গিয়েছিল। রাহুল আর বন্ধুদের সঙ্গে খেলতে যায়নি। সে স্কুল থেকে বেরিয়ে একাই ধীরে-ধীরে হেঁটে যাচ্ছিল বাড়ির পথ ধরে। বন্ধুরা কেউ ছিল না তার সঙ্গে।

রাস্তায় লোকজন ছিল খুব কম। কিছু দূর যাওয়ার পর রাহুল দেখতে পেল, একটা বিশাল ঝুড়ি নামানো বটগাছের তলায় বসে রয়েছেন থুথুড়ে এক বুড়ো ভদ্রলোক। এমনভাবে আছেন, মনে হচ্ছে ঘুমোচ্ছেন তিনি। তাঁর গায়ের রং মিশমিশে কালো, মাথায় একটাও চুল নেই। মুখজোড়া ধবধবে সাদা দাড়িগোঁফ। গায়ের চামড়া কোঁচকানো। দেখলেই বোঝা যায়, অনেক বয়স হয়েছে তাঁর। রাহুল এগিয়ে গেল তাঁর দিকে। উনি কি অসুস্থ, না মারা গিয়েছেন? ভাবল রাহুল।

হঠাৎ চোখ মেলে রাহুলের দিকে তাকালেন সেই থুথুড়ে বুড়ো ভদ্রলোক। তাঁর বয়স হলে কী হবে, চোখের নজর খুব তীক্ষ্ণ এবং অস্বাভাবিক উজ্জ্বল। সাধারণ বয়স্ক মানুষদের মতো নয়।

“আপনি এই গাছতলায় বসে আছেন কেন? আপনার সঙ্গে কি কেউ নেই?” রাহুল প্রশ্ন করল বুড়ো ভদ্রলোককে।

বুড়ো ভদ্রলোক কোনও জবাব না দিয়ে তীক্ষ্ণ, উজ্জ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন রাহুলের মুখের দিকে। আশ্চর্য, একবারও তাঁর চোখের পলক পড়ল না। গভীর রহস্যময় সেই দৃষ্টি!

রাহুলের ধারণা হল, ভদ্রলোকের চলাফেরা করার বা কথা বলার মতো শক্তি নেই। হয়তো দু'-তিনদিন ওঁর পেটে কিছুই পড়েনি। তার দুঃখ হল ভদ্রলোকের জন্য। সে নিজের ব্যাগ থেকে টিফিনের বাক্সটা বের করল। সেদিন তাড়াতাড়ি ছুটি হয়ে যাওয়ায় তার আর স্কুলে টিফিন খাওয়া হয়নি।

তিনটে রুটি আর একটু আলুর তরকারি বুড়ো ভদ্রলোকের দিকে এগিয়ে ধরে রাহুল বলল, “এই যে, এটা খেয়ে নিন। আমি বুঝতে পেরেছি আপনার খুব খিদে পেয়েছে।”

বুড়ো ভদ্রলোক কিন্তু রুটিটা নিতে হাত বাড়ালেন না। তিনি রাহুলের মুখের দিকে তাকিয়েই রইলেন তীক্ষ্ণ, উজ্জ্বল দৃষ্টিতে।

হঠাৎ একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল, যার জন্য রাহুল মোটেই প্রস্তুত ছিল না। ওই রুটি-তরকারি কে যেন জোর করে কেড়ে নিল রাহুলের হাত থেকে। সেগুলো কিন্তু মাটিতে পড়ল না, হাওয়ায় ভাসতে-ভাসতে সোজা বুড়ো ভদ্রলোকের মুখের কাছে চলে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে তিনি হাঁ করলেন। সে কী বিরাট হাঁ! রুটি-তরকারি সোজা ঢুকে গেল তাঁর মুখের মধ্যে। তারপর বন্ধ হয়ে গেল তাঁর মুখ।

বিস্ময়ে রাহুলের চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। এ কি ম্যাজিক? কোনও ভুতুড়ে ব্যাপার? সে বুঝতে পারল, বুড়ো ভদ্রলোক কোনও সাধারণ মানুষ নন। তাঁর ওভাবে তাকানোটাই অত্যন্ত রহস্যময়। এখান থেকে সরে পড়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ মনে করল রাহুল। এক পা, দু' পা করে পিছোতে লাগল সে।

কিন্তু তার পক্ষে সরে পড়া আর সম্ভব হল না। হঠাৎ কে যেন রাহুলকে মাটি থেকে শূন্যে তুলে নিল। তারপর নিয়ে চলল বুড়ো ভদ্রলোকের কাছে। হাত-পা খুব আড়ষ্ট মনে হল রাহুলের। সে অনুভব করল, একটা অশরীরী শক্তি যেন জোর করে বসিয়ে দিল তাকে ভদ্রলোকের পাশে।

রীতিমতো ভয় পেয়ে রাহুল আর্তনাদ করে উঠল, "আমাকে নামিয়ে দিন, ছেড়ে দিন, আমি বাড়ি যাব।"

বুড়ো ভদ্রলোকের গলায় একটা চাকা ঘোরার মতো ঘড়ঘড়ে আওয়াজ হতে লাগল। সেই আওয়াজটা আস্তে-আস্তে মিলিয়ে গিয়ে খুব মিহি সুরে কথা শোনা গেল, "ভয় নেই তোমার, আমি তোমার কোনও ক্ষতি করব না। তোমার দয়ামায়া আছে, তুমি খুব ভাল ছেলে। আমার তোমাকে পছন্দ।"

আশ্চর্য, বুড়ো ভদ্রলোক এত কথা বললেন রাহুলকে, অথচ একটুও ঠোঁট নাড়লেন না।

"আমার নাম রাহুল।"

"বাঃ, বেশ নাম তোমার। তবে নামটাকে একটু ছোট করতে হবে।"

"কেন?"

"দরকার আছে। অত বড় নাম চলবে না। আমি শুধু সুবিধের জন্য তোমার নামটাকে একটু ছোট করে নিচ্ছি। তোমার নাম হবে 'হুল'।"

তার নামটাকে ছোট করে বুড়ো ভদ্রলোকের কী সুবিধে হবে, তা বুঝতে পারল না রাহুল। তবে হুল নামটা তার একেবারেই পছন্দ হল না।

রহস্যময় সেই ভদ্রলোক বললেন, "আমি হচ্ছি অন্য সময়ের মানুষ। এখানে এসেছি একটা বিশেষ দরকারে।"

"সে তো আপনার চেহারা আর দাড়ি-গোঁফ দেখেই বুঝতে পারছি," রাহুল বলল, "আপনার বয়স নিশ্চয়ই নব্বই পেরিয়ে গিয়েছে! কী, ঠিক বলেছি?"

"না, তোমাদের হিসেব অনুযায়ী আমার বয়স হল, মাইনাস এক হাজার তিনশো সাতাশ বছর," বুড়ো ভদ্রলোক বললেন।

মাইনাস! ভদ্রলোক বলেন কী? বয়সের এই উদ্ভট হিসেবটা রাহুলের বোধগম্য হল না। কথাগুলো বেশ রহস্যময়। অন্য সময়ের মানুষ। মাইনাস এক হাজার তিনশো সাতাশ বছর! ভদ্রলোক তার সঙ্গে মশকরা করছেন না তো!

"এর মানে বুঝলে না তো," বুড়ো বলে যেতে লাগলেন, "আজ থেকে এক হাজার তিনশো সাতাশ বছর পরে যে সময়, আমি সেই সময়ের মানুষ। সেই সময় অনুযায়ী আমার বয়স বত্রিশ বছর। তার মানে পৃথিবীর সময় অনুযায়ী আমি ভবিষ্যতের মানুষ, অর্থাৎ ভবিষ্যৎ কালের মানুষ। আমি বেড়াতে এসেছি তোমাদের সময়কালে। পৃথিবীর প্রাচীন ইতিহাস নিয়ে আমি এখন গবেষণা করছি। কিন্তু দেখছি, তোমাদের সময়ের জল, হাওয়া, ধুলোবালি এবং খাবারদাবার কিছুই আমার সহ্য হচ্ছে না। তিনদিনেই আমার চেহারা এরকম হয়ে গিয়েছে। তাই আমি ফিরে যেতে বাধ্য হচ্ছি আমার সময়কালে। তবে যাওয়ার আগে গবেষণার স্বার্থে আমি যোগাযোগের একটা মাধ্যম তৈরি করতে চাই। তুমিই হবে আমার সেই যোগাযোগের মাধ্যম।"

বুড়ো মানুষটার কথা শুনে রাহুল ভাবল যে, ভদ্রলোক নিশ্চয়ই আস্ত পাগল। উলটোপালটা বকে যাচ্ছেন। কিন্তু পাগল হলেও আশ্চর্য ক্ষমতার অধিকারী।

"আপনার যোগাযোগের মাধ্যম হব আমি?" রাহুল বিস্মিত কণ্ঠে বলল।

ভদ্রলোক রাহুলকে বুঝিয়ে দিলেন, ঠিক কীভাবে সে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে কাজ করবে। প্রথমে তিনি রাহুলের ডান পায়ের গোড়ালিতে আলপিনের মাথার মতো ছোট একটা বস্তু চেপে ধরলেন। রাহুল সঙ্গে-সঙ্গে অনুভব করল, তার সারা শরীর কাঁপছে, চোখ ভারী হয়ে এসেছে। মাথা ঝিমঝিম করছে। সারা শরীরের মধ্যে একটা অদ্ভুত আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে!

একটু পরে বুড়ো ভদ্রলোক তাঁর হাত সরিয়ে নিতে রাহুল দেখল, আলপিনের মতো বস্তুটা তাঁর হাতে নেই। ভদ্রলোক বললেন, "ব্যস, তোমার শরীরে সময়-নিয়ন্ত্রক যন্ত্র বসে গিয়েছে। তার মাধ্যমে তোমার সঙ্গে আমার যোগাযোগ থাকবে। এখানে আমার কাজ আপাতত শেষ, এবার আমি আমার সময়ে মানে আমার কালে ফিরে যাব।" ভদ্রলোক বলে যেতে লাগলেন, "তোমার মাধ্যমে আমরা পৃথিবীর প্রাচীন যুগের ইতিহাসের তথ্য সংগ্রহ করব। তোমার চোখ দিয়ে আমরা সব কিছু দেখব, তোমার কান দিয়ে শুনব। তবে আমাদের সঙ্গে তোমার যোগাযোগের কথা কাউকে জানিও না। এমনকী, তোমার বাবা-মাকেও নয়। জেনে রাখো, তোমার মধ্যে অনেক পরিবর্তন ঘটবে, যা তোমার কাছে অকল্পনীয়! তোমাকে যদি পঞ্চাশজন লোকও একসঙ্গে আক্রমণ করে, তুমি শুধু তোমার মনের শক্তি প্রয়োগ করে অনায়াসে তাদের হারিয়ে দিতে পারবে। তোমার ইচ্ছাশক্তি যে-কোনও জিনিসকে অনায়াসে মাটি থেকে শূন্যে তুলে নেবে। প্রজাপতির মতো ওড়াবে। ইচ্ছে করলে তুমিও আকাশে উঠে প্রচণ্ড দ্রুতগতিতে আকাশপথে উড়ে যেতে পারবে! তোমার কানে যখনই হুল শব্দটা পাঁচবার উচ্চারিত হবে, তখনই বুঝবে যে, আমরা তোমার সময়ের এলাকায় পৌঁছে গিয়েছি।"

"আমি আপনাদের দেখতে পাব?" রাহুলের প্রশ্ন।

"না, তুমি আমাদের দেখতে পাবে না। কিন্তু আমাদের কণ্ঠস্বর শুনতে পাবে, আমাদের সঙ্গে কথা বলতে পারবে। অন্য কারও কানে আমাদের কথা পৌঁছোবে না।"

একটু ভেবে নিয়ে প্রশ্ন করল রাহুল, "আমি যদি কখনও আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে চাই, তখন কী করব?"

"খুব সহজ," বুড়ো ভদ্রলোক বললেন, "হুল নামটা পরপর পাঁচবার উচ্চারণ

বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকায় থাকুক বা না-ই থাকুক, পরীক্ষায় বাংলায় ভালো নম্বর পেতে হলে পড়তেই হবে

বামনদেব চক্রবর্তীর বইগুলো

১। ভাষাশিক্ষায় হাতেখড়ি (V) — ব্যাকরণ ও নির্মিতি
২। অঙ্কুরে ব্যাকরণ ও রচনা (VI)
৩। বাণী-বিচিত্রা (VII-VIII) — ব্যাকরণ ও নির্মিতি (২০০৬ সংস্করণে নতুন সংযোজিত ১৭টি প্রবন্ধ সহ)
৪। ছাত্রবোধ বাংলা ব্যাকরণ (IX - X)
৫। ছাত্রবোধ বাণী - বিচিত্রা (IX - X) — নির্মিতি (নব-সংযোজিত ১৩টি প্রবন্ধসহ — ২০০৬ সংস্করণ)
৬। উচ্চতর বাংলা ব্যাকরণ (IX - X) — সম্পূর্ণ ব্যাকরণ
৭। মাধ্যমিক বাণী - বিচিত্রা (IX - X) — পূর্ণাঙ্গ নির্মিতি
৮। ব্যবহারিক বাংলা ব্যাকরণ 'ক' ভাষা (XI - XII)
৯। ব্যবহারিক বাংলা ব্যাকরণ 'খ' ভাষা (XI - XII)
১০। উচ্চ-মাধ্যমিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস

প্রতিটি বই-ই পাওয়া যাচ্ছে

মধ্যশিক্ষা পর্ষদের ২০০৪-এর পাঠ্যসূচী অনুসারে সুলিখিত এবং অনুমোদিত — বাংলা বিষয়ে

শ্রীমতী কেয়া রায়চৌধুরীর বইগুলো

১। সাহিত্য-মালঞ্চ (VI) পাঠ্যগ্রন্থ
২। সাহিত্য-মালঞ্চ (VII) পাঠ্যগ্রন্থ
৩। সাহিত্য-মালঞ্চ (VIII) পাঠ্যগ্রন্থ
৪। ভাষা-মালঞ্চ (VI) ব্যাকরণ ও নির্মিতি
৫। ভাষা-মালঞ্চ (VII-VIII) ব্যাকরণ ও নির্মিতি
৬। মালঞ্চ-সংকলন (VI) সহায়কপাঠ
৭। মালঞ্চ-সংকলন (VII) সহায়কপাঠ
৮। মালঞ্চ-সংকলন (VIII) সহায়কপাঠ

গণিতে গৃহশিক্ষকের অভাব মেটাতে প্রয়োজন

কুঙ্কুম চক্রবর্তীর

গণিত - মালঞ্চ (অবজেকটিভ - IX - X)

বাংলা ভাষায় একখণ্ডে ক্যুইজের বৃহত্তম সংকলন

ক্যুইজ ১১১১১ (দাম ১৬০)

বিভিন্ন বিষয়ে ১১১১১ টি আকর্ষণীয় প্রশ্নোত্তরের চমৎকার সম্ভার, অজস্র ছবিসহ বোর্ড বাঁধাই

অক্ষয় মালঞ্চ

বি-৫, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা - ৭
দূরভাষ — ৫৫১০ - ৭৩৩০

করলেই একটা বিশেষ আলোক-তরঙ্গের সৃষ্টি হবে। সেই আলোক-তরঙ্গ সময়ের পরদাগুলো ভেদ করতে-করতে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে আমাদের কাছে পৌঁছে গেলেই আমরা সাড়া দেব। তার অবশ্য দরকার হবে না। কারণ, আমরা তো সব সময় তোমার উপর নজর রাখছি।"

রাহুল বুঝতে পারল না, কী করে শুধু দু' অক্ষরের একটা নাম পাঁচবার উচ্চারণ করে অন্য সময় অর্থাৎ অন্য কালের মানুষদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব! এ তো কল্পনাই করা যায় না যে, বিশেষ আলোক-তরঙ্গ সময়ের পরদা ভেদ করে!

বুড়ো ভদ্রলোক বললেন, "এবার আমি আমাদের সময়ে ফিরে যাব।"

"সে তো অনেকটা পথ। কী করে যাবেন?" রাহুল বলল।

"পথ নয়, আমাকে অতিক্রম করতে হবে সময়। আমি এখন যেখানে বসে আছি, এটা আমার সময়যানের বসার আসন। আর এই সময়যানটি রয়েছে আমার গবেষণাগারে একটি বিশাল গোলাকার কাচের ঘরের মধ্যে।"

রাহুলের চোখ কপালে উঠে গেল। সে বিস্মিত কণ্ঠে বলল, "এখানেই আপনার গবেষণাগার! এই গাছ, আশপাশের ঘরবাড়ি, ওই রাস্তা..."

"এসবের কোনও অস্তিত্বই নেই। তোমরা হলে প্রাচীন ইতিহাস, তোমাদের সম্পর্কে আমাদের সময়ের মানুষদের কোনও ধারণাই নেই।" বলতে-বলতে বুড়ো ভদ্রলোক যেভাবে বসে ছিলেন, সেভাবেই আস্তে-আস্তে উপরে উঠতে লাগলেন। বললেন, "আমার এই নরম ধাতুর বুদ্বুদে তৈরি আসনটি তোমাদের সময়ের মাটির সংস্পর্শ থেকে সরে এসেছে। এখন আমি ফিরে যাচ্ছি হুল। ভাল থেকো।"

অবাক বিস্ময়ে রাহুল দেখল, তার চোখের সামনে মুহূর্তে বুদ্বুদের মতো মিলিয়ে গেলেন রহস্যময় ওই বুড়ো মানুষটি।

রাহুল বসে রইল সেই গাছতলায়। অনেকক্ষণ। নিজের চোখ-কানকেই বিশ্বাস করতে পারছিল না সে। এক হাজার তিনশো সাতাশ বছর পরের, সুদূর ভবিষ্যতের একজন মানুষ তার সঙ্গে কথা বলে গেলেন, এও কি সম্ভব?

॥ ২ ॥

বুড়ো ভদ্রলোকের কথা সকলের কাছে চেপে গেল রাহুল। পরদিন ভোরবেলা ঘুম ভাঙতেই রাহুল ঠিক করল, ভবিষ্যৎ কালের ওই মানুষটার কথা অনুযায়ী সত্যিই তার মনোবল দশ হাজার গুণ বেড়ে গিয়েছে কি না, তা পরীক্ষা করে দেখবে। বিছানায় বসেই সে বিড়বিড় করে বলল, "দরজা খুলে যাক।"

খুটখাট আওয়াজ হল, দরজার পাল্লা খুলে গেল। ভীষণ বিস্মিত হল রাহুল।

"এখানে বসেই দাঁত মাজব আমি," রাহুল বলল, "ব্রাশ আর টুথপেস্ট আমার কাছে চলে আসুক।"

কী আশ্চর্য! হাওয়ায় ভাসতে-ভাসতে চলে এল তার টুথব্রাশ এবং পেস্টের টিউব। ব্রাশে পেস্ট লাগানোর পর টিউবটাকে বলল রাহুল, "যেখানে ছিলে, সেখানেই চলে যাও।"

সঙ্গে-সঙ্গে টুথপেস্টের টিউবটা যেন অদৃশ্য ডানা মেলে উড়ে বেরিয়ে গেল তার ঘর থেকে। চুপ করে থাকতে না পেরে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে সে চেঁচিয়ে উঠল, "ইয়াহু!"

সেদিন স্কুলে যাওয়ার পথে একটা অদ্ভুত ব্যাপার রাহুলকে বেশ বিস্মিত করল। অনেক দূরের গাছগুলোর প্রত্যেকটি পাতা খুব স্পষ্ট দেখতে পেল সে। এমনকী, একটি পাতায় কয়েকটি ছোট পিঁপড়েও তার নজরে ধরা পড়ল। একেবারে বাইনোকুলারে দেখার মতো। তার মানে, তার দৃষ্টিশক্তিও আশ্চর্য রকম বেড়ে গিয়েছে।

রাস্তার উলটো দিক থেকে একটা মোটরগাড়ি আসছিল। রাহুল সেদিকে তাকিয়ে আপনমনে বলে উঠল, "গাড়িটার ব্রেক ফেল করলে বেশ মজা হয়।"

সঙ্গে-সঙ্গে সে দেখতে পেল, গাড়িটা একবার ডান দিকে, একবার বাঁ দিকে এঁকেবেঁকে ছুটছে। সেই গাড়ির ভিতর থেকে একটা আর্ত চিৎকার শোনা গেল, "বাঁচাও, বাঁচাও, ব্রেক ফেল করেছে।"

পরক্ষণেই রাস্তার পাশের একটা গাছের সঙ্গে সংঘর্ষ হল গাড়িটার। আশপাশে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা সকলে হইহই করে ছুটে এলেন।

"হে ভগবান," রাহুল বলল, "কারও যেন কোনও ক্ষতি না হয়!"

গাড়িটার ভিতরে তিনজন আরোহী ছিলেন। সামান্য চোট পেলেও আশ্চর্যজনকভাবে প্রাণে বেঁচে গেলেন তাঁরা, তবে গাড়িটা দুমড়ে গেল। রাহুলের আপশোস হল, ধাক্কা লাগার আগেই গাড়িটাকে হয়তো থামিয়ে দেওয়া যেত।

পাঁচবার হুল নামটি শুনতে পেয়ে থমকে দাঁড়াল রাহুল। এর মানে, বুড়ো ভদ্রলোকের কথা অনুযায়ী তাঁর সময়ের সঙ্গে রাহুলের যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। একটি কণ্ঠস্বর ভেসে এল, "কোনও নিরীহ মানুষের ক্ষতি করার জন্য ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করতে নেই।"

"দুঃখিত," রাহুল বলল, "আমি শুধু একটু টেস্ট করতে চেয়েছিলাম। ক্ষতি হবে বুঝতে পারিনি।"

"আর এরকম করতে যেও না।"

"কারও ক্ষতি না করে যদি একটু-আধটু মজা করি মাঝে-মাঝে?"

"ছেলেমানুষ," মন্তব্য কানে এল রাহুলের।

ক্লাসের মধ্যে বেশ কয়েকটা মজার ঘটনা ঘটল। অঙ্কের মাস্টারমশাই ব্ল্যাকবোর্ডে কয়েকটা সহজ অঙ্ক করতে গিয়ে বারবার ভুল করলেন। ইংরেজির স্যার রিডিং পড়তে গিয়ে হঠাৎ তোতলাতে লাগলেন। ভূগোলের মাস্টারমশাই ব্ল্যাকবোর্ডে ভারতবর্ষের ম্যাপ আঁকতে গিয়ে চারটে আস্ত চক ভেঙে টুকরো-টুকরো করে ফেললেন।

ক্লাসের ছেলেরা হাসাহাসি করতে লাগল। রাহুলের ইচ্ছাশক্তিই যে এসব অঘটন ঘটিয়েছে, তা কেউ বুঝতে পারল না।

রাতে খাবার টেবিলে বসে রাহুল ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে মায়ের হাত থেকে ডালের বাটিটা ফেলে দিল। বাটিটা নিজেই যেন ছিটকে বেরিয়ে এল এবং নীচে পড়ার আগে সকলের পাতে একটু করে ডাল ঢেলে দিল। বাবা বিস্মিত, মা অপ্রস্তুত।

নিজের ঘরে বিছানায় শুতে না-শুতে 'হুল' নামটি পাঁচবার শুনতে পেল রাহুল। পরক্ষণেই শোনা গেল সেই চেনা কণ্ঠস্বর, "যথেষ্ট মজা করেছ, আর নয়। অপ্রয়োজনে ক্ষমতার প্রয়োগ করতে যেও না। সংযত হও।"

রাহুল বুঝতে পারল, ব্যাপারটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গিয়েছে। অপ্রয়োজনে ক্ষমতার বাড়াবাড়ি করা যাবে না, সময়যাত্রী বলছেন। কী করে বোঝা যাবে, প্রয়োজনটা কখন হবে? নানা সম্ভাবনার কথা তার মাথায় এল।

॥ ৩ ॥

পরদিনই রাহুল ইচ্ছাশক্তির কাজে লেগে গেল। তখন সন্ধে হয়-হয়। মাঠ থেকে খেলার পর বাড়ি ফিরছিল রাহুল, একাই। হঠাৎ তার চোখে পড়ল, অনেকটা দূরে দু'টো ষন্ডামার্কা লোক একজন মধ্যবয়স্ক মানুষকে কিল, ঘুসি, লাথি মারছে। জায়গাটা নির্জন। এদিক-ওদিক দু'-একজন লোক থাকলেও কেউ এগিয়ে আসেনি তাদের থামাতে। রাহুল সেদিকে এগিয়ে গেল। তার দেখাদেখি দু'-তিনজন পথচারীও। রাহুল বলল, "অ্যাই, তোমরা ওঁকে মারছ কেন? থামো বলছি!"

কী আশ্চর্য! ওই অবস্থাতেই থমকে গেল তারা। দাঁড়িয়ে রইল পাথরের মূর্তির মতো!

যে ভদ্রলোক মার খাচ্ছিলেন, তিনি কাঁদতে-কাঁদতে জানালেন যে, ওই দু'জন তাঁকে মারধোর করে তাঁর সব টাকাপয়সা কেড়ে নিতে যাচ্ছিল।

"আপনার টাকা-পয়সা নিয়ে নিয়েছে কি?" রাহুল প্রশ্ন করল ভদ্রলোককে।

"না, নিতে পারেনি," বললেন ভদ্রলোক।

গুন্ডা দু'টোকে রাহুল বলল, "তোমরা কান ধরে ওঠবোস করতে থাকো, পুলিশ না আসা পর্যন্ত।"

পথচারীদের তাক লেগে গেল। তারা রাহুলকে জিজ্ঞেস করল, "কী আশ্চর্য, এরা তোমার কথা শুনছে!"

রাহুল মৃদু হাসল।

ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে দু'-দুটো বদমাশকে এত সহজে শায়েস্তা করার পর, বাড়ি ফিরেই সে যোগাযোগ করল সময়যাত্রীর সঙ্গে।

"কাজটা ঠিক হল না। ওই কাজটা তোমার নয়, পুলিশের। তুমি ওদের থামিয়ে দিয়ে যদি পুলিশকে গিয়ে জানাতে, তা হলে যা করার পুলিশই করত। কেউ কিছু বুঝতে পারত না। তুমি যদি লোককে জানিয়ে দাও যে, তোমার অসাধারণ ক্ষমতা আছে, তা হলে ভুল করবে। বদমাশদেরও দল আছে। তারা তোমার অজান্তে তোমার উপর আক্রমণ চালাতে পারে।"

হতাশ কণ্ঠে রাহুল বলল, "তা হলে আমি কী করব?"

সময়যাত্রী বললেন, "আড়াল থেকে যতটুকু সাহায্য করা যায়, ততটুকুই করবে। তোমার দ্বারা যে কিছু হয়েছে, তা কাউকে বুঝতে দেবে না।"

এর কয়েকদিন পরের কথা। টিফিনের সময় স্কুলের তেতলার ছাদে কয়েকটা দুষ্টু ছেলে ছোটাছুটি করছিল। তেতলার ছাদে ওঠা ছেলেদের বারণ। একজন মাস্টারমশাই তা দেখতে পেয়ে বেত হাতে উঠলেন ছাদ থেকে ছেলেগুলোকে নামিয়ে আনার জন্য।

নীচ থেকে রাহুল লক্ষ করল, একটি ছেলে বেত্রাঘাত এড়াতে ছাদের একদম ধারে চলে গিয়েছে। হঠাৎ পা ফসকে সে ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে গেল ছাদ থেকে। নীচ থেকে চেঁচিয়ে উঠল সকলে, "ধর, ধর, পড়ল।"

মাটিতে পড়লে ছেলেটা আর বাঁচত না। রাহুল চেঁচাল, "হাত বাড়িয়ে কার্নিসটা ধর!"

সঙ্গে-সঙ্গে ছেলেটার দু'হাত প্রসারিত হল এবং কার্নিস আঁকড়ে ধরে সে ঝুলতে লাগল। কয়েকজন মাস্টারমশাই ও স্কুলকর্মী ছুটে গেলেন ছাদে এবং ছেলেটাকে টেনে তুললেন। ততক্ষণে সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে।

সকলে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। কেউ ভাবল না, জ্ঞানহারা অবস্থায় শূন্যে কয়েক ইঞ্চি সরে গিয়ে হাত বাড়িয়ে ছেলেটা কার্নিসটা আঁকড়ে ধরল কী করে? একজন মাস্টারমশাই বললেন, "আমরা ওকে ধরার পরই ও জ্ঞান হারায়। আগে হলে তো রক্ষে ছিল না।"

সেদিন বাড়ি ফেরার পর পাঁচবার হুল শব্দটি শুনতে পেয়ে উৎকর্ণ হল রাহুল। তখন কয়েকজন বন্ধু ছিল তার সঙ্গে। সময়যাত্রীর কথা শোনা গেল, "শুনে যাও, কোনও জবাব দিতে হবে না। তোমার আজকের কাজটা ঠিক হয়েছে। এভাবেই মানুষের উপকার করতে হয়।"

রাহুলের মুখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

এক রবিবার মা-বাবার সঙ্গে রাহুল চিড়িয়াখানায় বেড়াতে গেল। প্রস্তাবটা সময়যাত্রীর ছিল। তিনি বলেছিলেন রাহুলকে, "তোমাদের পৃথিবীর সময়ে

অনেক প্রাণীকে খাঁচায় বন্ধ করে রাখা হয়। তারা যেখানে থাকে, সে জায়গাটা একবার দেখতে চাই।"

চিড়িয়াখানায় খুব ভিড় ছিল সেদিন। রাহুল মা-বাবাকে সঙ্গে নিয়ে জেব্রা, শিম্পাঞ্জি, বাঁদর, গন্ডার, বাঘ, সিংহ ইত্যাদি প্রাণী দেখতে লাগল। হঠাৎ রাহুল চেঁচিয়ে উঠল, "অ্যাই, হাত সরাও!"

"কী হল, কাকে বলছিস?" বাবা বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন।

রাহুল কোনও কথা না বলে ছুটে গেল অনেকটা দূরে, চিতাবাঘের খাঁচার দিকে। সেখানে অনেক লোক জড়ো হয়েছিল। একটা বাচ্চা ছেলেকে বকাবকি করছিল সকলে।

"আর-একটু হলেই হাতটা যেত," একজন বলছিলেন ছেলেটার মাকে, "ওভাবে খাঁচার মধ্যে কেউ হাত ঢোকায়!"

"মনে হল এক ঝটকায় হাতটা টেনে বের করে দিল কেউ," একজন প্রত্যক্ষদর্শীর মন্তব্য।

রাহুলের বাবা বিস্মিত হয়ে রাহুলকে বললেন, "তুমি অত দূর থেকে কী করে দেখতে পেলে?"

"অত ভিড় ছিল না তখন," রাহুল বলল, "আমি ওই দিকেই তাকিয়ে ছিলাম।"

প্রতিটি খাঁচার সামনে লাগানো নেমপ্লেটের উপর চোখ বোলাতে ভোলেনি রাহুল। তার এতটা উৎসাহ দেখে বিস্মিত হলেন মা-বাবা। ফেরার পথে মা বললেন, "তোমার তো এবার নিয়ে পাঁচবার আসা হল চিড়িয়াখানায়। এর আগে তো এত উৎসাহ ছিল না! ব্যাপার কী?"

মৃদু হেসে রাহুল উত্তর দিল, "তখন ছোট ছিলাম, এখন বড় হয়েছি।"

॥ ৪ ॥

রাহুল তার স্কুলের ফুটবল টিমের দু'নম্বর গোলকিপার। এক নম্বর গোলকিপার মনোজ। কোনও ম্যাচে খেলার সুযোগ পেত না রাহুল। কারণ, এক নম্বর গোলকিপার কোনও কারণে মাঠে নামতে অসমর্থ হলে তবেই রাহুলের মাঠে নামার কথা। এজন্য তার মনে খুব দুঃখ ছিল। সময়যাত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করল রাহুল। ফুটবল টিমে তার অবস্থানের কথা, মনোজের কথা সময়যাত্রীকে জানাল সে। তারপর বলল, "কালকের ম্যাচটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ওই একটা ম্যাচে অন্তত আমি খেলতে চাই।"

"ঠিক আছে, তুমি এই ম্যাচে খেলবে, গোলও বাঁচাবে। কিন্তু মনে রেখো, যেটুকু শক্তি প্রয়োগ করলে চলে, তার বেশি শক্তি তুমি প্রয়োগ করবে না। আর তোমার ক্ষমতা সম্পর্কে কাউকে কিছু জানতে দেবে না।"

পরদিন স্কুলে যেতেই রাহুল শুনতে পেল, টিমের এক নম্বর গোলকিপার মনোজ রাতে হঠাৎ জ্বরে কাবু হয়ে পড়েছে। অতএব সে খেলতে পারবে না।

খেলার মাস্টারমশাইকে চিন্তিত দেখাল। বিষণ্ণ কণ্ঠে বললেন তিনি, "আমি ঠিক এই ভয়টাই করছিলাম। আজকের ম্যাচে হারা-জেতার উপর অনেক কিছু নির্ভর করছে, অথচ আজকেই মনোজ অসুস্থ।"

রাহুল বলল, "আপনি মোটেই ভাববেন না স্যার, আজ আমরা জিতব।"

"কী করে? ওদের টিমের ফরোয়ার্ড লাইনে যারা খেলবে, তারা প্রত্যেকেই খুব ভাল প্লেয়ার!"

"আমি খুব একটা খারাপ খেলব না স্যার, আপনি দেখবেন! ওরা একটা গোলও দিতে পারবে না।"

"দেখা যাক, তবে আমি তোমার কথার উপর ভরসা করতে পারছি না!"

খেলা শুরু হল। অসাধারণ কৃতিত্বের সঙ্গে সারাক্ষণ বিপক্ষের খেলোয়াড়দের আক্রমণের মোকাবিলা করে গেল রাহুল। বুলেটের মতো ছুটে আসা প্রতিটি বল অনায়াস ভঙ্গিতে লুফে নিল রাহুল। বলটা যেন তার ভীষণ বাধ্য। সে হাত বাড়াতেই সোজা তার নাগালের মধ্যে চলে আসছে।

দর্শকরা তো থ! রাহুল যে এত ভাল খেলতে পারে, তা খেলার মাস্টারমশাইও কল্পনা করেননি।

খেলা শেষ হওয়ার একটু আগে স্কুল-টিমের এক নম্বর স্ট্রাইকার সুভাষ একটা অসাধারণ গোল করে জিতিয়ে দিল টিমকে।

খেলা শেষ হলে ছুটে এসে রাহুলকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন খেলার মাস্টারমশাই। তিনি গদগদ কণ্ঠে বললেন, "অসাধারণ তোমার খেলা রাহুল। তুমি এত ভাল খেলো, তা আমি বুঝতে পারিনি। এর পরের সব ম্যাচেই তুমি খেলবে।"

"না স্যার," রাহুল বলল, "মনোজ সুস্থ হয়ে উঠবে। ও খেলবে পরের ম্যাচগুলোয়।"

"না, না। তুমি থাকতে..."

"আমি আর খেলব না স্যার। আমি শুধু একটা ম্যাচে খেলতে চেয়েছিলাম, নিজের যোগ্যতা যাচাই করার জন্য। আপনি সুযোগ দিয়েছেন বলে ধন্যবাদ স্যার," রাহুল বলল।

॥ ৫ ॥

সময়যাত্রী এক রাতে রাহুলকে বললেন, "জানো, তুমি যখন তোমার বইগুলো পড়াশোনা করো, তখন আমরা সবচেয়ে বেশি খুশি হই।"

"এ তো তুমি আমার মায়ের মতো কথা বললে," রাহুল বলল, "মা সারাক্ষণ আমাকে পড়তে বলেন।" রাহুল জানতে চাইল যে, সময়যাত্রীর সময়ে ওর পাঠ্য বইগুলো পাওয়া যায় কি না।

"না," সময়যাত্রী বললেন, "আমাদের যুগে বইয়ের কোনও অস্তিত্বই নেই। মিউজিয়ামে কিছু রাখা ছিল, সেসব গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে গিয়েছে অনেক আগেই!"

"তাই নাকি!" রাহুল বিস্মিত হয়ে বলল, "আমি বই পড়লে তোমরা খুশি হও কেন? এতে তোমাদের লাভ কী?"

সময়যাত্রী জবাব দিলেন, "পৃথিবীর প্রাগৈতিহাসিক যুগ সম্পর্কে অনেক অজানা তথ্য জানতে পারি তোমার বইগুলো থেকে। যেমন, তোমার ভূগোল বই থেকে এ-দেশের প্রাচীন কালের আকৃতি, ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু, ইত্যাদি সম্পর্কে অনেক বিষয় জানা গিয়েছে। তোমাদের যুগের অনেক নদী, পর্বত, সাগর-উপসাগরের প্রাচীন নাম আমাদের অজানা ছিল।"

"ভূগোল ছাড়া আর কোন বিষয়ে তোমরা জানতে চাও?"

"এ-দেশের প্রাচীন যুগের ইতিহাস, সমাজব্যবস্থা ও অর্থনীতির উপর অনেক আলোকপাত করেছে তোমার বইগুলো। এসব ব্যাপারে আরও তথ্য চাই আমরা।"

রাহুল চুপ করে রইল। সময়যাত্রী বলে চললেন, "এ ছাড়া তোমার বাংলা বই থেকে একজন কবির লেখা সংগ্রহ

গ ল্প

করেছি, আমাদের ছেলেমেয়েদের এ-দেশের অতি প্রাচীন কাব্য-সাহিত্য সম্পর্কে আগ্রহী করার জন্য।"

"কবিতাটি নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা?"

"হ্যাঁ, এই লেখকের আরও কিছু কবিতা তুমি পড়লে ভাল হয়।"

"আমি পড়লেই তোমাদের কাজ হয়ে যাবে?"

"অবশ্যই, তোমার চোখ দিয়ে আমরা তোমার সময়ের সব কিছু দেখি এবং তা সঙ্গে-সঙ্গে রেকর্ড করে নিই। সুতরাং তুমি যেখানে যে বই পাবে, পড়বে।"

"দুর, সব কিছু পড়তে কি ভাল লাগে?"

"বেশ তো, যদি পড়তে ইচ্ছে না করে, তবে অন্তত বইয়ের দিকে তাকিয়ে পাতা উলটে যেও, আমরা ফোটো তুলে নেব।"

রাহুল প্রশ্ন করল, "আচ্ছা, আমাকে দিয়ে কয়েকটা বই পড়ানো ছাড়া আর কী করাতে চাও তোমরা?"

"আমরা সারাক্ষণ তোমার সঙ্গে আছি। তুমি মাঝে-মাঝে বিভিন্ন জায়গায় বেড়াতে যেও, তাতে আমাদের অনেক উপকার হবে। বনে, জঙ্গলে, পাহাড়ে-পর্বতে..." সময়যাত্রী বললেন।

"বনে-জঙ্গলে তো সাপখোপ, বাঘ-ভল্লুক থাকে। আমি সেসব জায়গায় যাব কী করে?"

"তোমার সময়কালে যেসব জন্তু-জানোয়ার আছে, আমাদের সময়কালে সেসব প্রাণী বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। আমরা তাদের দেখতে চাই।"

"সে তো চিড়িয়াখানাতেই দেখেছ।"

"উন্মুক্ত পরিবেশে তারা কীভাবে চলাফেরা করে, তা-ও আমরা দেখতে চাই। তোমাদের সময়ের গাছপালাগুলোকে চিনে রাখলে আমাদের গবেষণার সুবিধে হবে।"

পরদিন সকালেই রাহুল মাকে বলল, "মা, এবার ছুটিতে সুন্দরবন বেড়াতে যেতে হবে।"

মা অবাক হয়ে জানতে চাইলেন, হঠাৎ তাঁর ঘরকুনো ছেলের বেড়াতে যাওয়ার শখ হল কেন?

"হঠাৎ নয় মা," রাহুল বলল, "আমি বেশ কিছুদিন ধরেই ভাবছি এই নিয়ে। মাঝে-মাঝে একটু বেড়ানো দরকার। নতুন-নতুন অনেক কিছু দেখা যায়, শেখা যায়।"

মা বললেন, "অনেকেই তো যেতে বলে, কিন্তু যাওয়া আর হয়ে ওঠে না। বর্ধমানে তোর মাস্তুমাসির বাড়ি বা সোধপুরে হরুকাকার..."

মাথা নেড়ে রাহুল বলল, "না, না, আমরা সুন্দরবন যাব। নৌকো করে ঘুরব, বনজঙ্গল ঘুরে দেখব। রয়াল বেঙ্গল টাইগার দেখব। প্লিজ় মা, তুমি বাবাকে বলো।"

রাহুল জানে যে, তার প্রস্তাবে রাজি হওয়া ছাড়া কোনও উপায় নেই মা-বাবার। নিজের প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তিকে প্রয়োগ করে সে সুন্দরবন কেন, দেশের যে-কোনও অঞ্চলে বেড়াতে যাওয়ার ব্যাপারে তাঁদের সম্মতি আদায় করে নিতে পারে। তবে এখন রাহুল নিজের ক্ষমতা প্রয়োগের ব্যাপারে অনেকটাই সতর্ক।

রাহুলরা সুন্দরবন যাবে শুনে অনেকেই আগ্রহী হল তাদের সঙ্গে বেড়াতে যাওয়ার জন্য। তারপর নির্দিষ্ট একটা দিনে বারো জনের একটা দল ক্যানিং থেকে যন্ত্রচালিত নৌকো ভটভটিতে চড়ে রওনা হল সুন্দরবনের উদ্দেশে।

ভটভটির ছাদের উপর মাঝি হাল ধরে বসেছিল। রাহুল তার পাশে গিয়ে বসল। যে নদী দিয়ে ভটভটি যাচ্ছে, তার নাম কী, এর পর কোন-কোন নদী পেরিয়ে তারা গোসাবায় পৌঁছবে, যেতে কতক্ষণ সময় লাগতে পারে, ইত্যাদি নানারকম তথ্য মাঝির কাছ থেকে সংগ্রহ করার পর সে খোলা আকাশের নীচে প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে শুরু করল।

রাহুলের দৃষ্টিশক্তি অত্যন্ত প্রখর। ঘণ্টাখানেক পর হঠাৎ সে মাঝির দৃষ্টি আকর্ষণ করল, প্রায় পাঁচশো গজ দূরে ডান দিকের পারের অনতিদূরে বিপজ্জনকভাবে কাত হয়ে থাকা একটা ভটভটির দিকে। উদ্বেগের সঙ্গে বলল রাহুল, "ওরে বাবা, এত লোক উঠেছে ওই নৌকোটায়! দ্যাখো, কীভাবে কাত হয়ে পড়েছে ভটভটিটা! উলটে যাবে না তো?"

"যেতে পারে," মাঝি নিরাসক্তভাবে বলল, "কিন্তু এত দূর থেকে তুমি কীভাবে বুঝলে যে, ওই ভটভটিতে অনেক লোক উঠেছে? আমি তো বুঝতে পারছি না। আর-একটু কাছে না যাওয়া পর্যন্ত..."

মাঝির কথা রাহুলের কানে গেল বলে মনে হল না। সে দূরের সেই কাত হওয়া ভটভটির দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, "কী সর্বনাশ! কিছু লোক জলে লাফিয়ে পড়ে সাঁতরে ডাঙায় ওঠার চেষ্টা করছে! ভটভটিটা দুলছে, আরও কাত হচ্ছে। থেমে যাও, আর কেউ জলে ঝাঁপ দেওয়ার চেষ্টা কোরো না। ভটভটিটা স্থির হয়ে থাক," রাহুলের মনে হল যেন তার মুখ দিয়ে সময়যাত্রীই কথাগুলো বলে যাচ্ছেন। সে মাঝির দিকে উৎকণ্ঠিত নজরে তাকিয়ে বলল, "চলো, ওই ভটভটিটার কাছে গিয়ে দেখি, ব্যাপারটা কী!"

মাঝি অবাক হল রাহুলের অস্বাভাবিক আচরণে। সে বলল, "যাচ্ছি। ওটা হল পাঠানখালির ঘাট।"

খুবই বিপজ্জনকভাবে কাত হয়ে ছিল ভটভটিটা। নানা বয়সের অনেক লোক তার মধ্যে বসে আর দাঁড়িয়ে ছিল। তাদের প্রত্যেকের মুখেই ছিল আতঙ্ক। কাছাকাছি পৌঁছে রাহুলদের ভটভটির মাঝি গলা চড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, "কী হল?"

বিপন্ন ভটভটির মাঝি জবাব দিল, ভটভটিটা চরে ধাক্কা খেয়ে উলটে যাচ্ছিল। অনেক কষ্টে সামলেছি।"

"তোমার ভটভটিতে এত বেশি লোক তুলতে গেলে কেন? ওলটালে তো অনেক মানুষের জীবন যেত। তোমার কি কোনও আক্কেল নেই? নাও, এবার ভটভটিটাকে ঠেলে বের করো। যাবে কোথায়? গোসাবা?"

"হ্যাঁ, বের করার তো চেষ্টা করে যাচ্ছি অনেকক্ষণ ধরে, বেরোচ্ছে না। চরে আটকে গিয়েছে। তুমি একটু টেনে দাও না ভাই, নইলে হবে না। এখান থেকে জল সরে গেলে জোয়ার না আসা পর্যন্ত বসে থাকতে হবে," মাঝি বলল।

একটা মোটা কাছির দড়ি দিয়ে সেই ভটভটিটার এক প্রান্ত বেঁধে নিয়ে রাহুলদের নৌকো মাঝনদীর দিকে যাওয়ার চেষ্টা করল। একটু-একটু করে পিছিয়ে, অবশেষে, জলমগ্ন চর থেকে মুক্ত হল বিপন্ন ভটভটি। তারপর জলের উপর স্বাভাবিকভাবে ভাসতে লাগল।

যারা ভয় পেয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, তারা ভিজে কর্দমাক্ত পোশাকে ডাঙার পিছল মাটির উপর দাঁড়িয়ে

দেখতে পেল যে, তাদের ভটভটিটা মাঝনদীতে যাওয়ার জন্য ঘুরছে। তাদের কয়েকজন হাত নেড়ে চেঁচিয়ে উঠল, "আমরাও যাব, দাঁড়াও।"

অনেক হাঁকডাক, অনুনয়-বিনয় সত্ত্বেও মাঝি কিন্তু কিছুতেই আর ভটভটির মুখ ঘোরাল না ডাঙার দিকে। সে বেশ মেজাজের সঙ্গে বলল, "তোমরা অন্য ভটভটিতে এসো ভাই, আমারটায় আর জায়গা হবে না।"

যার প্রবল ইচ্ছাশক্তি ওই ভটভটি আর তার আরোহীদের একটা বিরাট বিপদের হাত তেকে রক্ষা করল, সেই রাহুল তখন নির্বিকারভাবে ভটভটির উপর বসে নদীর জলে পানিপায়রা ও বালিহাঁসদের ঘোরাফেরা এবং চরে লাল কাঁকড়াদের ছোটাছুটি লক্ষ করছে।

গোসাবায় তাদের সঙ্গে যোগ দিলেন গগনবাবু, রাহুলের বাবার বন্ধু। উনি স্থানীয় স্কুলের শিক্ষক। অনেক শুকনো খাবার এবং পানীয় জল ভটভটিতে তুলে নেওয়া হল গোসাবা থেকে। তারপর ভটভটি রওনা হল সজনেখালির দিকে। সজনেখালিতে সুন্দরবন ব্যাঘ্রপ্রকল্পের অফিস। সেখান থেকে অনুমতি সংগ্রহ করে তবেই যাওয়া যাবে গভীর জঙ্গলের মধ্যে, যেখানে বাঘ ও অন্য প্রাণীরা থাকে। জালের মতো ছড়িয়ে থাকা নদীপথে ভটভটিটা ঘুরে বেড়াবে দ্বীপ থেকে দ্বীপে, ব্যাঘ্রপ্রকল্পের তৈরি জাল দিয়ে ঘেরা ওয়াচটাওয়ারে উঠে গা ছমছম করা নির্জনতার মধ্যে আগন্তুক মানুষগুলোর কৌতূহলী চোখ চারপাশের জঙ্গলে খুঁজে বেড়াবে রয়াল বেঙ্গল টাইগার।

সজনেখালি থেকে দরকারি অনুমতি ও গাইড নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন তাঁরা। নদীপথের দু'পাশে শুধু জঙ্গল, কোনও জনমানব নেই। নিস্তব্ধ পরিবেশে সরব শুধু ভটভটির মেশিন।

প্রথম যে ওয়াচটাওয়ারে গেলেন তাঁরা, সেখানেই রাহুল ভয় পাইয়ে দিল সকলকে। জালের বেড়া ডিঙিয়ে হরিণকে ধাওয়া করে জঙ্গলের দিকে ছুটে গেল সে।

রাহুলের মা ভীষণ ভয় পেয়ে কান্নাকাটি করতে লাগলেন। বাবা কী করবেন বুঝতে না পেরে ছুটে গেলেন বন্দুকধারী পাহারাদারদের কাছে। তারপর প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে বললেন, "ছেলেটাকে বাঘে খেয়ে ফেলবে! আপনারা এখনও দাঁড়িয়ে আছেন? শিগগির যান।"

মিনিট কুড়ি পর রাহুল ফিরে এল, হাসিমুখে। সে বলল, "ঘুরে-ঘুরে দেখলাম এই দ্বীপটা। দ্বীপটায় বাঘ নেই। তবে হরিণ আছে অনেক। বুনো শুয়োরও দেখা গেল। নানারকম রংবেরঙের পাখি আছে। চলো, এর পরের টাওয়ারে যাওয়া যাক। সেখানে হয়তো..."

"এখন সোজা বাড়ি চলো। খুব হয়েছে," রাহুলের মা চোখের জল মুছে বললেন, "এমন দস্যি ছেলেকে নিয়ে আমাদের সুন্দরবনে বেড়াতে আসাটাই ভুল হয়েছে।"

"গতকাল সকালেই বাঘ একটা ছাগলকে নিয়ে গিয়েছে," ওই ওয়াচটাওয়ারের একজন পাহারাদার বলল।

"সে বাঘটা এতক্ষণ অন্য দ্বীপে চলে গিয়েছে," রাহুল বলল।

"বলা যায় না। লুকিয়ে থাকলে বাঘকে খুঁজে বের করা কঠিন," পাহারাদারটি মন্তব্য করল।

পরের ওয়াচটাওয়ার থেকেও বাঘের দেখা মিলল না। শুধু হরিণ আর কচ্ছপ। অনেক পাখি ও মৌমাছির চাক দেখা গেল।

বাঘের সঙ্গে দর্শনার্থীদের সাক্ষাৎ হল নেতাধোপানিতে।

কাছেই একটা পুকুরে বাঘকে জল খেতে দেখে রাহুল অন্যদের প্রবল আপত্তি ও চেঁচামেচি সত্ত্বেও জালের বেড়া অতিক্রম করে নির্ভয়ে হেঁটে এগিয়ে গেল বাঘটার দিকে। বাঘটা মুখ তুলে তার দিকে তাকাল, বিরাট হাঁ করল। কিন্তু কী আশ্চর্য, রাহুলকে আক্রমণ করল না সে। যেন বেশ ভয় পেয়েছে এমন ভাব দেখিয়ে এক পা, এক পা করে পিছোতে-পিছোতে সে হঠাৎ ঘুরে ঘন জঙ্গলের দিকে পালাল।

"কী সাংঘাতিক ছেলে রে বাবা, একটুও ভয়ডর নেই?" দর্শনার্থীদের একজন আশ্চর্য হয়ে বলল।

রাহুল ফিরে আসতেই তাকে ঘিরে ধরল সকলে। সে হেসে বলল, "লম্বা লেজওলা বাঁদর দেখতে গিয়েছিলাম।"

"কিন্তু ওখানে তো বাঘ ছিল, যদি আক্রমণ করত?"

"বাঘ পিছন থেকে আক্রমণ করে, সামনে থেকে নয়। আমার মুখোমুখি হতেই ও ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল," বলল রাহুল।

নেতাধোপানি থেকে ফিরে চলল তারা। রাহুল বলল মাকে, "আর-একটু বড় হলে আমি একা আসব। রয়াল বেঙ্গল টাইগারকে আরও কাছ থেকে ভাল করে দেখব এবং তার বাসস্থান খুঁজে বের করব।"

মা সভয়ে বললেন, "একা আসবে? আমি বেঁচে থাকতে তোমাকে আর সুন্দরবনে আসতে দিচ্ছি না।

ফেরার পথে ভটভটির ছাদে বসে সময়যাত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করল রাহুল, "আমাদের যুগের সুন্দরবন কেমন লাগল?"

"খুব ভাল," সময়যাত্রী বললেন, "অনেক নতুন তথ্য পেয়েছি।"

"আপনাদের যুগের সুন্দরবন?" রাহুল প্রশ্ন করল।

"এখন ও বনের কোনও অস্তিত্বই নেই। নদীগুলোও সব বুঝে গিয়েছে," সময়যাত্রীর কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

"আর বাঘ?" সবিস্ময়ে প্রশ্ন করল রাহুল।

"সাড়ে সাতশো বছর আগে এই প্রজাতির শেষ বাঘটার মৃত্যু হয়েছে," উত্তর দিলেন সময়যাত্রী।

রাহুলের সব যেন কীরকম স্বপ্নের মতো মনে হতে লাগল। এও সম্ভব! অন্য স্পেস অ্যান্ড টাইমের একজন মানুষের সঙ্গে প্রতিদিন কথা হচ্ছে তার। যে মানুষটি এখন রয়েছেন এক হাজার তিনশো সাতাশ বছর এগিয়ে, অর্থাৎ ভবিষ্যৎ কালে, তিনি তাঁর সময়ের হিসেব অনুযায়ী ঠিক এক হাজার তিনশো সাতাশ বছর অতীত পৃথিবীর ইতিহাস, ভূগোল বিজ্ঞান ও অন্যান্য তথ্য সংগ্রহ করছেন বর্তমানের রাহুলের কাছ থেকে! রাহুলের মনে পড়ে গেল এইচ জি ওয়েলস-এর সেই বিখ্যাত কল্পবিজ্ঞান কাহিনি 'দ্য টাইম মেশিন'-এর কথা। কিন্তু সে তো নেহাতই সায়েন্স ফিকশন। তার এই বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা কেউ বিশ্বাস করবে কি?

ছবি: অনুপ রায়

বিকানিরের বিস্ময়

গামলার কিনারায় স্যারি দিয়ে দুধ খাচ্ছে ইঁদুরের দল

স্থানীয় মানুষরা বলে 'চুহামন্দির'। সেখানে অসংখ্য ইঁদুরের মধ্যে সাদা ইঁদুরের দেখা পেলে নাকি যে-কোনও মানুষের ভাগ্য খুলে যায়! রাজস্থানের বিকানির ঘুরে এসে লিখেছেন **শাম্বাদিত্য দাশ**

চারদিকে অসংখ্য ইঁদুর! ঘুরে বেড়াচ্ছে যেখানে-সেখানে। ঠাকুরের সামনে, মন্দিরের প্রাঙ্গণে, রসুই ঘরে, ভাঁড়ার ঘরে—কেউ তাড়াচ্ছে না। মারছেও না কেউ। এখানে যেন ইঁদুরের মা-বাবা, দাদু-দিদা, ঠাকুমা-ঠাকুরদা, সকলে রয়েছে!

হেঁয়ালি রেখে এবার আসল কথায় আসা যাক। আসলে, এই ইঁদুরগুলো রয়েছে রাজস্থানের বিকানিরের এক মন্দিরে। মন্দিরের অতন্দ্র প্রহরী এরা! অটো বা ট্যাক্সি ড্রাইভাররা বলে 'চুহামন্দির'। বিকানির থেকে ৩০ কিলোমিটার দূরে দেশনুক বলে একটি জায়গায় আছে এই মন্দির।

বাইরে থেকে দেখলে আর পাঁচটা সাধারণ মন্দিরের মতোই মনে হয় এই সৌধটিকে। কিন্তু এর আসল রহস্য ভিতরে, যেখানে সেই অসংখ্য ইঁদুর আপনমনে খেলে বেড়াচ্ছে।

রাজস্থানে বেড়াতে গিয়ে আমাদের ভ্রমণ শুরু হয়েছিল বিকানির থেকে। প্রথমে দেশনুক। বাস থেকে নেমে যখন মন্দিরের সামনে দাঁড়ালাম, তখন বুঝতেই পারিনি, কত বিস্ময় অপেক্ষা করে আছে আমাদের জন্য। ঢুকেই দেখি, চারদিকে শুধুই ইঁদুর! চালের বস্তায়, দুধের গামলায় সর্বত্র শুধু ইঁদুর আর ইঁদুর। একটা-দু'টো নয়, শ'য়ে-শ'য়ে। মাঝে-মাঝেই ইঁদুর চলে যাচ্ছে পায়ের উপর দিয়ে। আমাদের সঙ্গে যে ছোট ছেলেমেয়েরা ছিল, তারা তো কেউ ভয়ে নামতেই চাইল না মায়ের কোল থেকে। উঠোন ছাড়িয়ে মূল মন্দিরে ঠাকুর প্রণাম করতে গেলাম। সেখানে গিয়েও দেখি শ'য়ে-শ'য়ে ইঁদুর। একদল সাহসী ইঁদুর তো আবার ঠাকুরের ভোগ, লাড্ডুর উপর নৃত্য করছে। আর মাঝেমধ্যে লাড্ডু খাচ্ছে।

মন্দির থেকে বেরিয়ে মোজেইক করা উঠোনে নেমে দেখা হল এই মন্দিরে যিনি দুধ দেন, তাঁর সঙ্গে। মাথায় রাজস্থানি পাগড়ি। সহজ-সরল মানুষ, নাম প্রতাপ দান চারণ। তিনি প্রতিদিন এই মন্দিরে দু'বেলা দুধ দিয়ে যান ইঁদুরদের জন্য! দুধ দেওয়ামাত্র ঝাঁপিয়ে পড়ে ইঁদুরের দল। দুধের গামলার কিনারায় সার দিয়ে বসে দুধ খেতে শুরু করে। যেসব ইঁদুর জায়গা পায় না, তারা দুধের গামলার মাঝখানে দুধে পা ডুবিয়ে দুধ খায়। এই রকম দুধে ভর্তি গামলা রয়েছে মন্দিরের চারদিকে।

মন্দিরের ভিতর ঘুরে বেড়াচ্ছে সাদা ইঁদুর

এই মন্দিরের আসল নাম করণীমাতার মন্দির। করণী দুর্গারই আর-এক রূপ। এই করণীমাতাকে নিয়ে বছরে দু'বার মেলা বসে। মেলার নাম 'করণীমাতার মেলা'। এই সময় নানা জায়গা থেকে ভক্তরা আসে। প্রথম মেলা হয় এপ্রিল বা মে মাসে, পরের মেলা অক্টোবর বা নভেম্বরে। মন্দিরের প্রবেশদ্বারটি সুদৃশ্য ও কারুকার্যময়। তাতে বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি খোদাই করা। যোধপুর যাওয়ার পথে পড়ে বিকানির। কথিত আছে, করণীমাতাই বিকানির রাজ্য প্রতিষ্ঠার ভবিষ্যদ্বাণী করেন এবং রাজা রাও বিকাকে বরদান করেন। এই মন্দিরের দরজাগুলো রুপোর। এগুলো তৈরি করেছিলেন গঙ্গা সিংহ।

স্থানীয় লোকরা ইঁদুরকে বলে 'কাবা'। ওরা 'চুহা' বলে না। এত কাবার মধ্যে আছে কিছু সাদা কাবা, মানে সাদা ইঁদুর। স্থানীয় মানুষরা বলে, এই সাদা ইঁদুরের দেখা পেলে নাকি মানুষের ভাগ্য খুলে যায়! এই সাদা ইঁদুরগুলোকে সব সময় দেখা যায় না। আমরা দেখতে পেয়েছিলাম মোট তিনটি সাদা ইঁদুর। মন্দিরের নিয়ম, কোনও মানুষের পায়ের চাপে যদি কোনও সাদা ইঁদুর মারা যায়, তা হলে তাকে একটা রুপোর ইঁদুর তৈরি করে মন্দিরে দান করতে হবে। এই নিয়ম চলে আসছে বহুদিন থেকে।

সত্যিই ইঁদুরদের স্বর্গরাজ্য বিকানিরের এই মন্দির!

ফোটো: সুখেন্দু দাশ

অমিল খোঁজো তফাত বোঝো

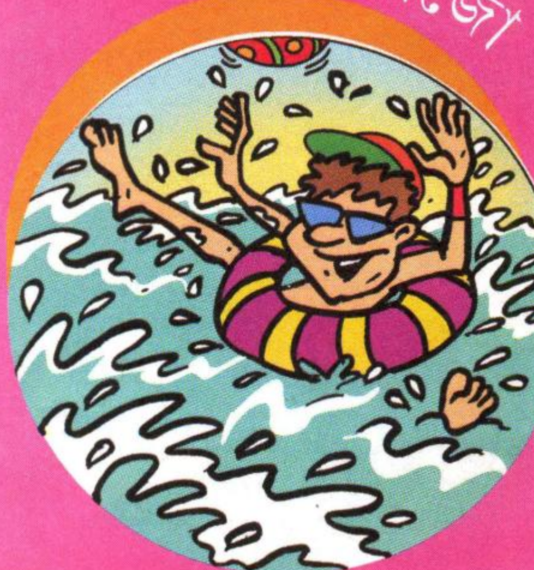

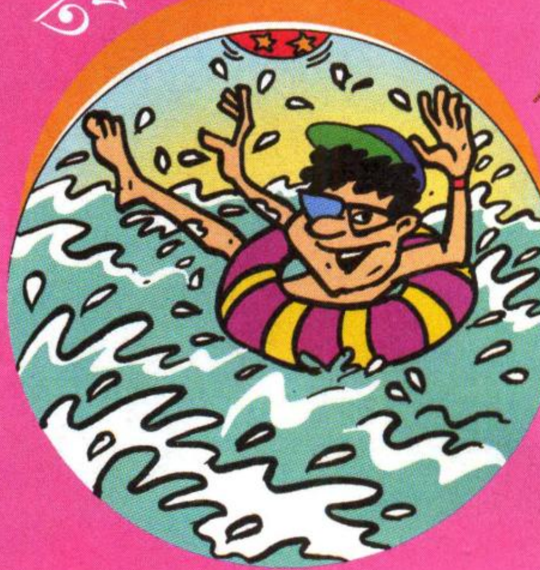

উপরের এই ছবি দুটি দেখতে একইরকম। কিন্তু ঠিকমতো খুঁজলে পাওয়া যাবে অন্তত আটটি অমিল। খুঁজে বের করতে পারাটাই মজা। আড়চোখে আগেভাগে উত্তর দেখো না কিন্তু! উত্তর ডান দিকের পাতায়। *ছবি: সৌরভ মুখোপাধ্যায়*

হাসছি দ্যাখো

অলকেশবাবু তাঁর দোতলা বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে ছিলেন। হঠাৎ ময়লা, অপরিষ্কার জামাকাপড় পরা এক ছোকরা তাঁর বাড়ির ঠিক নীচে এসে দাঁড়াল। তারপর চেঁচিয়ে অলকেশবাবুকে বলল, "দাদা, একটু নীচে আসবেন? একটা দরকার ছিল।"

অলকেশবাবু তাড়াতাড়ি নীচে নেমে আসতেই ছোকরাটি বলল, "দাদা, যদি দু'টাকা ভিক্ষে দেন!"

অলকেশবাবু বললেন, "আশ্চর্য, এই কথাটা বলার জন্য আমাকে নামতে বললে! নীচ থেকে বললেই তো হত!"

"আসলে, সকলের সামনে চেঁচিয়ে ভিক্ষে করতে লজ্জা করে তো তাই!" হেসে বলল ছোকরাটি।

"ঠিক আছে, উপরে এসো আমার সঙ্গে।"

অলকেশবাবুর পিছু-পিছু ছাদে উঠে এল ছেলেটি। অলকেশবাবু বললেন, "না হে, ভিক্ষেটিক্ষে হবে না।"

"সে-কথাটা তখন বলে দিলেই তো পারতেন," ভীষণ রেগে বলল ছোকরাটি।

"আমারও তো লজ্জাবোধ আছে, না কি? সকলের সামনে কিছু দিতে পারব না, বলতে পারি না আমি," অলকেশবাবুর উত্তর।

নাসিরুদ্দিন মাংসের কাবাব খাবেন বলে বাজার থেকে মাংস কিনে এনেছেন। তারপর বাইরে বেরিয়ে গিয়েছেন কী একটা কাজে। এদিকে তাঁর স্ত্রী লোভ সামলাতে না পেরে কাবাব রান্না করে পুরোটাই খেয়ে নিয়েছেন। নাসিরুদ্দিন বাড়ি ফিরে এসে কাবাবের কথা জিজ্ঞেস করতেই তাঁর স্ত্রী বললেন যে, বাড়ির পোষা বাচ্চা বিড়ালটা লুকিয়ে খেয়ে নিয়েছে সমস্ত মাংসটাই। নাসিরুদ্দিন সঙ্গে-সঙ্গে দাঁড়িপাল্লা এনে বিড়ালটাকে চাপিয়ে দিলেন পাল্লার উপর। দেখা গেল, বিড়ালের ওজন পাঁচশো গ্রাম। নাসিরুদ্দিন বেজায় রেগে স্ত্রীকে বললেন, "এটা যদি বিড়ালের ওজন হয়, তা হলে মাংসটা গেল কোথায়? আর যদি ধরে নিই এটাই সেই মাংসের ওজন, তা হলে বিড়ালটা গেল কোথায়?"

কপালে হাত বোলাতে-বোলাতে টুবলুকে কাঁদতে দেখে মা জিজ্ঞেস করলেন, "টুবলু, কাঁদছিস কেন?"

"দাদা আমাকে মেরেছে মা," কাঁদতে-কাঁদতে টুবলুর উত্তর।

মা দেখলেন টুবলুর কপালের এক দিকটা গোল হয়ে ফুলে উঠেছে।

"কী দিয়ে মেরেছিস ওকে? ওর কপালটা ফুলে উঠেছে ওরকম!" ভীষণ রেগে মা প্রশ্ন করলেন তাঁর ছেলেকে।

"রজনীগন্ধা ফুল ছুড়ে মা," টুবলু বলল।

"ফুল ছুড়ে মারলে কপাল ফুলে যায় ওইভাবে?" মা তো অবাক।

"শুধু ফুল ছুড়ে মারলে কিছু হয় না। আসলে রজনীগন্ধার স্টিকটা তো ছিল ফুলদানির ভিতর," নির্লিপ্ত উত্তর টুবলুর।

অর্থ শেখো

বাংলা ভাষায় বহু শব্দ আছে, যেগুলো আমরা কথোপকথনের সময় ব্যবহার করি না। আর তাই তার প্রকৃত অর্থও অনেক সময় জানা থাকে না। আবার এমন অনেক শব্দ আছে, যেগুলো কথাবার্তা চলার সময় অনিবার্যভাবেই চলে আসে জিভের ডগায়। কিন্তু সেগুলোরও সঠিক মানে সকলের জানা থাকে না। যে-কোনও শব্দের প্রকৃত অর্থ জানার মধ্যে রয়েছে এক আলাদা আনন্দ। নীচে কয়েকটি শব্দের আনুমানিক অর্থ দেওয়া আছে। যেটি সঠিক মনে হবে, তাতে দাগ দিতে হবে।

দিকপাল: (১) পরিপক্ব। (২) অত্যন্ত গুণী বা বিখ্যাত। (৩) লায়েক। (৪) মাতব্বর।

চাকরান: (১) ভৃত্যের কাজ। (২) চাকলা। (৩) চাকরিবাকরি। (৪) বেতনের পরিবর্তে ভৃত্যকে প্রদত্ত জমি।

চক্ষুদান: (১) চক্ষুলজ্জা। (২) নজর দেওয়া। (৩) চুরি। (৪) দৃষ্টিপাত।

বেমক্কা: (১) প্রচণ্ড বেগে। (২) সহসা। (৩) ভীরু, সন্ত্রস্ত। (৪) অশোভন।

প্রত্যাসন্ন: (১) একেবারে নিকটবর্তী। (২) দেরি নেই এমন। (৩) কাছে চলে এসেছে। (৪) প্রত্যাশিত।

গত সংখ্যার উত্তর

অবান্তর: (১) অপ্রাসঙ্গিক। 'নিরতিশয় অবান্তর প্রসঙ্গ এমন।' বনফুল

নিকুচি: (২) শেষ। 'তোর ব্যাগের নিকুচি করেছে।' বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

গাধাবোট: (৩) অত্যন্ত ধীরগতিবিশিষ্ট জলযান, যা মাল বয়ে নিয়ে যায়। 'মানোয়ারি জাহাজ গাধাবোট হয়ে গেল বোধ হয়।' অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

খারিজ: (১) পরিবর্তন। 'পুলিন তোমার খুড়োর সম্পত্তি খারিজ করতে হবে।' তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রুতিধর: (৪) একবার শোনামাত্রই যে মনে করতে পারে। 'সেকালে আমি কোনও শিক্ষার ধার ধারতুম না। এ-বিষয়ে আমি ছিলাম শ্রুতিধর।' প্রমথ চৌধুরী

স্কন্দগুপ্ত

অমিল খোঁজো, তফাত বোঝোর উত্তর

(১) ছেলেটির চুলের রং আলাদা। (২) চশমার একটা কাচ নেই। (৩) টুপির রং পালটে গিয়েছে। (৪) টিউবের বাঁ দিকের ডিজ়াইনে হলদে রং নেই। (৫) ছেলেটির সামনের পায়ের অংশ দেখা যাচ্ছে না। (৬) ছেলেটির বাঁ হাতের কবজির ব্যান্ডের সাইজ় ছোট। (৭) উপরের বলের ডিজ়াইন আলাদা। (৮) বাঁ হাতের কড়ে আঙুল দেখা যাচ্ছে না।

শব্দসন্ধান

সংকেত: পাশাপাশি

(১) দৈহিক শক্তি (৩) হ্রদ, জলাশয় (৫) মিশরকে এই নদী বাঁচিয়ে রেখেছে। (৮) আগাম দেওয়া টাকা, বায়না। (১০) লালের আভাযুক্ত। (১১) কোনও অক্ষম ব্যক্তির পরিবর্তে যে সই করে। (১৩) ছিঁচকে চুরির অভ্যেস। (১৫) গৌরব। (১৬) ময়ূরপুচ্ছ। (১৭) জল নিকাশের নালি। (২০) অসতর্ক, অসাবধান। (২১) নানারকমের।

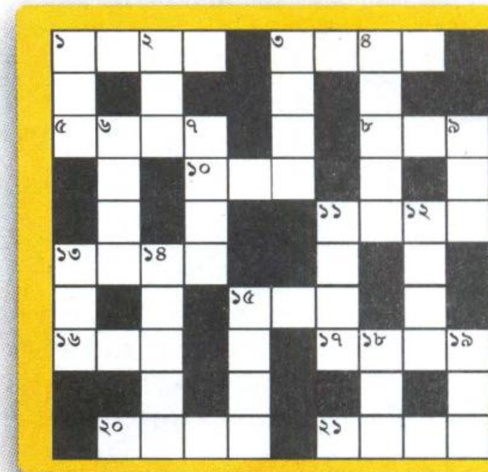

সংকেত: উপর-নীচ

(১) সেনাদল। (২) ত্যাগ করা। (৩) সমাবেশ। (৪) শক্তিবর্ধক। (৬) লজ্জায় মুখ নিচু করে আছে এমন। (৭) দেখা। (৯) কোমল। (১১) এই সময়। (১২) নিশানা বা লক্ষ্যবস্তু ভেদ করা। (১৩) ক্লান্ত হওয়া। (১৪) যা ফুরিয়ে গেলে দীনহীন হতে হয়। (১৫) হিসেবের খাতায় যা থাকা উচিত নয়। (১৮) যেই—সেই ভক্ষক। (১৯) মধ্যম আকারের কিংবা অবস্থার।

দেবসেনাপতি

গত সংখ্যার সমাধান

বে	কে	ন	বা	ও	য়া	র		মা	
বে		ক		য়ে			ই	রা	ন
তো	ত্তি		হে	ন	রি	ক		দো	
		শি		রু			রো	না	ল্ডো
	মা	ল	দি	নি			মা		
		ট			এ	ন	রি	কো	
জা	পা	ন			রি		ও		
	উ		ম্যা	স	ক	ট		পে	লে
সা	লে	স্কো			স		ফ্রা		মা
	টা		যু	র্গে	ন	ক্লি	ন্স	ম্যা	ন

নানা রঙের রামধনু

ব্রিটানিয়ার মজাদার অফার 'চক্কর টক্কর'

টাইগার বিস্কুট-এর সঙ্গে রয়েছে এক দারুণ অফার। ব্রিটানিয়া ইন্ডাস্ট্রিজ এবার ছোটদের জন্য নিয়ে এল 'চক্কর টক্কর'। পাঁচ টাকার একটা ব্রিটানিয়া টাইগার ক্রিম বিস্কুটের প্যাকেট কিনলে ছোটরা পেয়ে যাবে 'ফর্ক শুটার', 'স্পিনার', 'ফিঙ্গার শুটার'-এর মতো খেলনা। প্লাস্টিকের তৈরি এই খেলনাগুলো দিয়ে নিরাপদে গেম খেলতে পারবে তারা। একা-একাও খেলা যেতে পারে, আবার ইচ্ছে করলে কাউকে সঙ্গী করে অনায়াসে প্রতিযোগিতার আসরও বসাতে পারে বাড়ির ছোট ছেলেমেয়েরা।

হাঙ্গামা টিভির প্রতিযোগিতা, 'জন আউর কৌন'

ছোটদের জন্য এক দারুণ খবর! 'হাঙ্গামা টিভি' তাদের জন্য নিয়ে এসেছে দুর্দান্ত এক প্রতিযোগিতার আসর। নাচ ও অভিনয় দক্ষতাই এই প্রতিযোগিতার বিষয়বস্তু। প্রতিযোগিতার নাম 'ওরাল বি-জন আউর কৌন'। এই প্রতিযোগিতায় যারা যোগ দিতে ইচ্ছুক, তাদের বয়স হতে হবে সাত থেকে ১৪ বছরের মধ্যে। প্রতিযোগিতার ফর্ম পূরণ করে জমা দিতে হবে ৩০ জুনের মধ্যে। পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়: 'Jaun Aur Kaun, Post Bag No. 102, Azad Nagar Post Office, Mumbai-400 053। ওয়েবসাইটের ঠিকানা www.johnaurkaun.com। এর পর নির্বাচন করা হবে ৫,০০০ ছোট ছেলেমেয়েকে। তাদের নাচ ও অভিনয় দক্ষতা বিচার করার জন্য অডিশন নেওয়া হবে ভারতের পাঁচটি শহর—মুম্বই, দিল্লি, কলকাতা, হায়দরাবাদ এবং আমদাবাদ-এ। প্রাথমিক দু'রাউন্ড অডিশনের পর ফাইনাল রাউন্ডের জন্য বেছে নেওয়া হবে চারজন করে মোট আটজন ছেলেমেয়েকে। তারপর তাদের উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে মুম্বই। তাদের মধ্য থেকে বিজেতার শিরোপা উঠবে যে দু'জনের মাথায় (একজন ছেলে ও মেয়ে), তারা পাবে পাঁচ লক্ষ টাকা নগদ পুরস্কার আর সেই সঙ্গে হাঙ্গামা টিভির ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর জন আব্রাহাম-এর সঙ্গে 'ইউ টি ভি' প্রোডাকশনের হিন্দি মুভিতে অভিনয় করার সুযোগ।

'পাতচি'র চকোলেট তৈরির ওয়ার্কশপ

কলকাতার 'ফোরাম'-এ সেদিনটা ছিল শুধুই ছোটদের। চার থেকে আট বছরের ছেলেমেয়েদের চকোলেট তৈরি করা শেখালেন বিখ্যাত শেফ শন কেনওয়ার্দি (উপরের ছবি)। চকোলেট ট্রাফ্‌ল, আমন্ড ড্রপ ইত্যাদি জিভে জল আনা চকোলেট তৈরির আনন্দ উপভোগ করল ছেলেমেয়েরা। চকোলেট তৈরির এই ওয়ার্কশপ থেকে শেখার পর ছোটরা নিজে-নিজে চকোলেট তৈরি করতে পারবে কি ? "পারবে, তবে অভিভাবকের সাহায্য তো একটু নিতেই হবে," প্রশ্নের উত্তরে জানালেন শেফ কেনওয়ার্দি।

বই

কম্পিউটার নিজে শিখুন

(প্রথম ভাগ)

রিকি বুবকা

কম্পিউট্রনিক্স
৪১, বেনিয়াটোলা স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০০৫
দাম: ৮০ টাকা

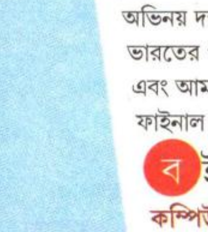

কম্পিউটার ব্যবহারের পদ্ধতি অত্যন্ত সহজ ও সাধারণভাবে বোঝানো হয়েছে 'কম্পিউটার নিজে শিখুন' বইটিতে। কম্পিউটার কাকে বলে? কম্পিউটার শেখার প্রয়োজনীয়তাই বা কী? সফ্‌টওয়্যার, হার্ডওয়্যার, মাউস পয়েন্টার কাকে বলে? ডেস্কটপ কী? কম্পিউটার হঠাৎ কাজ বন্ধ করে দিলে তখন কী করতে হবে? এরকম অজস্র বিষয় জানা যাবে এই বইটি থেকে। সহজ বাংলায় ছবি এঁকে সুন্দর করে বোঝানো হয়েছে প্রতিটি বিষয়। নিজে-নিজে কম্পিউটার শিখতে হলে এই বইটি যে আদর্শ, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

হাতির আদ্যোপান্ত

আবির গুপ্ত

পাত্র'জ পাবলিকেশন
২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩
দাম ৫০ টাকা

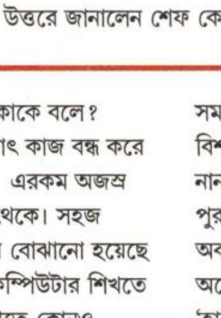

প্রাচীনকাল থেকেই হাতিকে বিশেষ সমাদর দিয়ে এসেছে সারা পৃথিবীর মানুষ। বিশালকায় এই প্রাণীটিকে নিয়ে লেখা হয়েছে নানা গল্প, তৈরি হয়েছে চলচ্চিত্র। আমাদের পুরাণ, লোককাহিনি, রূপকথার গল্পেও হাতির অবাধ বিচরণ। কিন্তু নিরীহ এই প্রাণীটি সম্বন্ধে অনেক কথাই আমাদের অজানা। আবির গুপ্তর 'হাতির আদ্যোপান্ত' বইটি থেকে জানা যাবে এই প্রাণীটি সম্বন্ধে অনেক কিছু। যেমন, হাতির শ্রেণিবিভাগ, ভারতবর্ষের কোথায় কত হাতি আছে, হাতি তাড়া করলে করণীয় কী—ইত্যাদি জানা-অজানা নানা তথ্য এক নজরে হাতের কাছে এনে দিয়েছে এই বই। রয়েছে হাতি নিয়ে অনেক ছবিও। বইটির প্রচ্ছদ ভাল, ছাপাও বেশ ঝরঝরে।

দ্বিতীয়বার বিশ্বকাপ আয়োজনের দায়িত্ব পেয়েছেন বেকেনবাউয়ার। লিখেছেন **চন্দন রুদ্র**

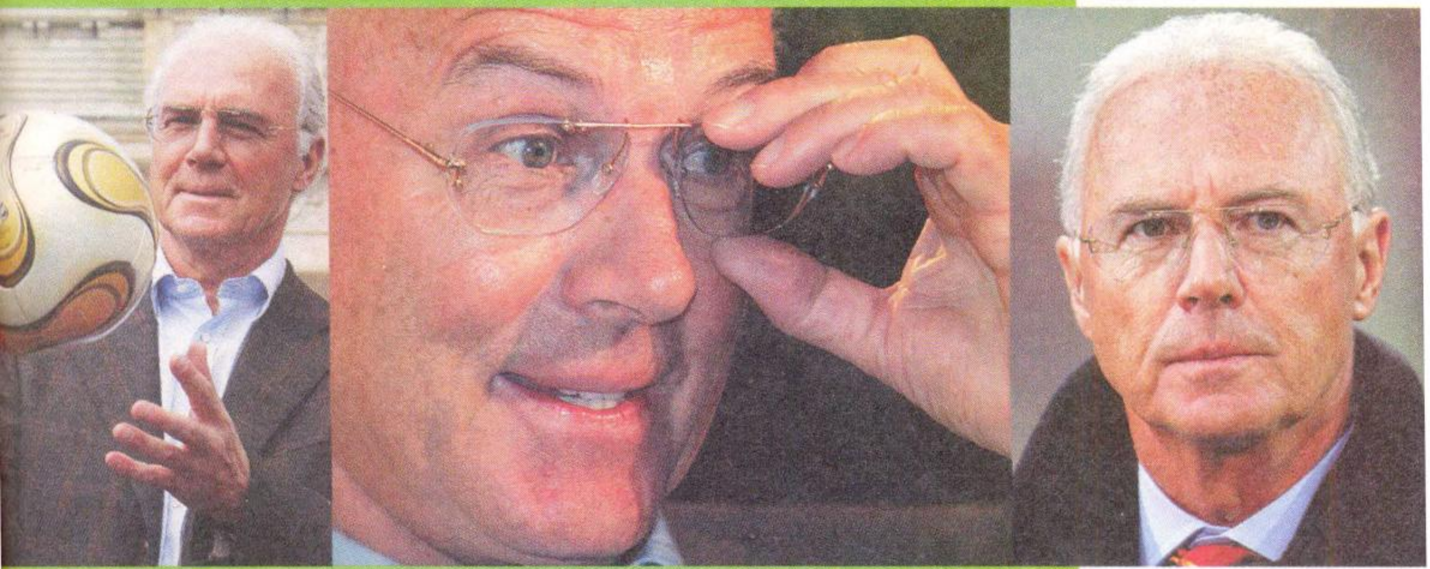

জার্মান ফুটবলের মহাতারকা

কিকঅফ

বিশ্বকাপে তারকা ফুটবলারদের নিয়ে উৎসাহের শেষ নেই। এবারের বিশ্বকাপে কে হবেন মহাতারকা, তা নিয়ে চলছে জল্পনাকল্পনা। তবে জার্মানি বিশ্বকাপের আসল মহাতারকা কিন্তু অন্য একজন। তিনি জার্মানির প্রবাদপ্রতিম ফুটবলার, এবারের বিশ্বকাপের আয়োজক কমিটির প্রধান ফ্রাঞ্জ কাইজার বেকেনবাউয়ার। জার্মানিতে দ্বিতীয়বার বিশ্বকাপের আসর বসানোর পিছনে সব কৃতিত্ব তাঁরই। ২০০০ সালে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর দক্ষিণ আফ্রিকাকে ১২-১১ ভোটে হারিয়ে দ্বিতীয়বার বিশ্বকাপ ফুটবল আয়োজনের দায়িত্ব পায় বেকেনবাউয়ারের দেশ। আয়োজক হওয়ার দৌড়ে শেষ পর্যন্ত বেকেনবাউয়ারকে সামনে রেখেই ১৯৭৪ সালের পর আবার জার্মানি বিশ্বকাপ আয়োজনের দায়িত্ব পায়। ইতালি, ফ্রান্স এবং মেক্সিকোর পর বিশ্বের চতুর্থ দেশ হিসেবে জার্মানিতে দ্বিতীয়বার বিশ্বকাপ হচ্ছে। এবারই প্রথম সংযুক্ত জার্মানি জুড়ে বসেছে বিশ্ব ফুটবলের মেগা মহারণ।

'টাইম টু মেক আ ফ্রেন্ড'—আয়োজনের দায়িত্ব পাওয়ার পর এমনই সরকারি স্লোগান তুলে বেকেনবাউয়ারের নেতৃত্বে ২০০৬ সালের বিশ্বকাপের দামামা বাজিয়েছিল জার্মানি। সংগঠক কমিটির প্রধান হিসেবে বিশ্বকাপের প্রচারে নেমে মূলপর্বে খেলা ৩২টি দেশের মধ্যে ৩১টিতে ঘুরে বিশ্বকাপের বার্তা নিপুণভাবে পৌঁছে দিয়েছেন কাইজার। ৬০ বছর বয়সেও এমন পরিশ্রমসাধ্য কাজ করেছেন হাসি মুখে। বেকেনবাউয়ার ফুটবলার এবং অধিনায়ক হিসেবে ১৯৭৪ সালে দেশকে যেমন বিশ্বকাপ এনে দিয়েছেন, তেমনই তাঁরই প্রশিক্ষণে ১৯৯০-তে ইতালি থেকে বিশ্বকাপ জিতে ফেরে জার্মানি। জার্মান ভাষায় ফ্রাঞ্জ বেকেনবাউয়ারকে 'কাইজার' নামে ডাকা হয়। যার অর্থ 'মহারাজ'। তিনি যথার্থ অর্থেই জার্মান ফুটবলের মহারাজা। ১৯৬৬ সালে ইংল্যান্ড বিশ্বকাপে জার্মানির হয়ে প্রথম বিশ্বকাপ খেলতে নেমেছিলেন বেকেনবাউয়ার। ফাইনালে ইংল্যান্ডের কাছে হেরে গিয়ে সেবার রানার্স হয়েছিল জার্মানি। ১৯৭০ সালে তৃতীয় স্থান অর্জনের পর লড়াকু জার্মানবাহিনী ১৯৭৪ সালে কাইজারের নেতৃত্বে নিজের দেশে যোহান ক্রুয়েফের দুর্ধর্ষ হাঙ্গারিকে ২-১ গোলে হারিয়ে দ্বিতীয়বার বিশ্বকাপ জিতেছিল। মুলার, ব্রাইটনার, বোন্‌হফ, ফোগটস্‌দের নিয়ে নিজের শহর মিউনিখে হাঙ্গারির আলোড়ন জাগানো 'টোটাল ফুটবল'কে থামিয়ে দিয়ে তারকা বনে গিয়েছিলেন বেকেনবাউয়ার। পরবর্তী পর্যায়ে ১৯৯০-এর ইতালি বিশ্বকাপে জার্মান দলের কোচ হিসেবেও বিশ্বকাপ জয়ের কৃতিত্ব অর্জন করেন তিনি। অধিনায়ক ও কোচ এই দ্বৈত ভূমিকায় বিশ্বকাপ জয় তাঁর আগে কেউ করতে পারেননি।

বিশ্বজয়ী ফুটবলার, বিশ্বজয়ী কোচ। জার্মান ফুটবলের প্রকৃত মহাতারকা তিনিই।

ফ্রাঞ্জ কাইজার বেকেনবাউয়ার

কাফু

এবার যাঁদের শেষ বিশ্বকাপ

সেই স্মরণীয় সাংবাদিক সম্মেলনে অবসরের কথা বলতে-বলতে চোখে জল এসে গিয়েছিল জিদানের। এবারের বিশ্বকাপই হয়ে রইল তাঁর মতো আরও অনেক উজ্জ্বল ফুটবল তারকার কেরিয়ারের শেষ ধাপ। লিখেছেন সুমন বন্দ্যোপাধ্যায়

বর্ণময় কেরিয়ার, ঝকঝকে 'সি ভি' অথচ যতিচিহ্ন কোথায় টানতে হয় জানেন না! যত বড় মহাতারকারাই হোন, অবধারিত প্রশ্ন উঠবেই, 'এখনও কেন...।' উদাহরণ? প্রচুর।

ফুটবলের লোথার ম্যাথাউস থেকে টেনিসের জিমি কোনর্স। ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডের কার্ল লিউইস থেকে গলফের নিক ফালডো। কেরিয়ারের মধ্যগগনে যখন বাড়তি কদর। সেরা সময় পেরিয়ে এলেই চাপা সংশয়, বিস্তর প্রশ্ন! কোথায় থামতে হবে, এটা জানাটাও তাই তারকা ভাবমূর্তি অটুট রাখার অবশ্য শর্তাবলির মধ্যেই পড়ে।

জিদান, রাউল, নেদভেদেরা লোথার ম্যাথাউসদের চেয়ে এজন্যই আলাদা! নিজেদের জাতীয় দলে এখনও অপরিহার্য, কেউ বলার সাহস পায় না যে, বুড়ো হয়ে গিয়েছেন ওঁরা। জিদানকে তো এবার প্রায় 'হাতে-পায়ে' ধরে 'লেস ব্লিউস'দের স্কোয়াডে ফিরিয়েছেন রেমন্ড ডোমেনেক, প্রাক বিশ্বকাপে যখন ফ্রান্স লেজেগোবরে হচ্ছে নিয়মিত। এমনকী জার্মানিতেও বারবার বোঝা গিয়েছে অঁরি, ভিয়েরারা থাকলেও দলটার হৃদয় এখনও সেই জিজুই। কিন্তু হলে কী, আগেই তো ঘটা করে ঘোষণা করে দিয়েছেন জিদান, "এই শেষ, আর ফুটবল নয়।"

মাদ্রিদের সেই স্মরণীয় সাংবাদিক সম্মেলনে এসব বলতে-বলতে চোখে জল এসে গিয়েছিল জিদানের। এবারের বিশ্বকাপই হয়ে রইল কেরিয়ারের শেষ ধাপ। শুধুই আন্তর্জাতিক আসর নয়, ক্লাব ফুটবল থেকেও সরে যাচ্ছেন জিজু। আসলে বয়স যে ক্রমশই থাবা বসাচ্ছে দক্ষতায়, বুঝতে পেরেছেন, আর তাই সরে যাওয়া একটুও দেরি না করে। ফুটবল বুট তুলে রাখার পর জিদানের জন্য হাহাকার থাকবে ফরাসি মননে, জলের মতো পরিষ্কার। আর এটাই তো সব খেলার তারকাদের স্বপ্ন। সরে যাওয়ার পরও অনুরাগী মহলে তাঁদের ঘিরে আকুলতা থাকুক। কিন্তু সব জেনেও সকলে পারেন না সঠিক সময়ে থামতে। আমাদের দেশে গাওস্কর পেরেছিলেন, আর সে জন্যই অবসরের ১৯ বছর পরও সানি সম্পর্কে ভারতীয় ক্রিকেট মহল অদ্ভুত মোহে আচ্ছন্ন।

শুধুই জিদান নন, এবারের বিশ্বকাপটাই শেষ বিশ্বকাপ

রোনাল্ডো

হয়ে রইল আরও অনেক তারকার। তালিকাটা ছোট নয়, তবে 'স্টার গ্যালাক্সি'তে কার-কার নাম ঢুকে পড়ল একবার দেখে নেওয়া যাক। রাউল, বেকহ্যাম, গ্যারি নেভিল, সল ক্যাম্পবেল, রোনাল্ডো, কাফু, রবের্তো কার্লোস, এমারসন, থুরাম, ভিয়েরা, দেল পিয়েরো, নেস্তা, ইনঝাগি, ক্রেসপো, সোরিন, নেদভেদ, কোলার, রাসিস্কি, পোবারস্কি, নিস্তেলরুই, কোনসেকা, সুয়ারেজ, বোরজেত্তি।

বিশ্বকাপ অধ্যায়ের একটা উজ্জ্বল পরিচ্ছেদই শেষ হয়ে যাচ্ছে এত তারকার এক সঙ্গে সরে যাওয়ায়। পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা পরের বিশ্বকাপে রোনাল্ডোহীন হয়ে পড়বে। দক্ষতার তুঙ্গে নেই, বোঝা গিয়েছে জার্মানিতেই। তবুও তিনি উজ্জ্বল। এখন দেখার, তিনবারের ফিফা বর্ষসেরা আর দু' বারের বিশ্বজয়ী দলে থাকা বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ (১৪টি) গোলদাতা রোনাল্ডো আর কতদিন ক্লাব ফুটবলে থাকেন। চার বছর পর দক্ষিণ আফ্রিকায় দেখা যাবে না বেকহ্যাম আর রবের্তো কার্লোসের ভয়ংকর সুন্দর সব ফ্রি-কিক। ইদানীং বিশ্বফুটবলের সেরা বিজ্ঞাপনগুলোর অন্যতম হয়ে রয়েছে যেগুলো। 'স্প্রিংবক'দের দেশে ২০১০ সালে বিশ্বকাপের সময়টায় হলফ করে বলা যায়, জার্মানির লকার রুমে থাকবে না এবারকার মতো চাপা টেনশন। অলিভার কান আর জেন্স লেম্যান নিজেদের দিনে দু'জনেই বিশ্বসেরা। কিন্তু সমস্যা যেটা, ওঁদের মধ্যেকার সম্পর্কটা প্রায় সাপে-নেউলের এবং দু'জনকে সামলানো যে কতটা বিপদসঙ্কুল, তা হাড়ে-হাড়ে বুঝেছেন এবার ক্লিন্সম্যান। পরের বিশ্বকাপে জার্মান কোচকে অন্তত এই হ্যাপা আর পোয়াতে হবে না।

রাউল

এবারই শেষ খেলে ফেললেন বিশ্বকাপ যাঁরা, সেই লম্বা তালিকায় এমন তারকাদেরই সংখ্যাধিক্য, যাঁরা কোনওদিনই পাননি সোনার পরির স্পর্শ। কী করবেন আর, বিশ্বকাপ পাননি বলে তো আর যুগের পর যুগ খেলে যেতে পারেন না। বয়স, দক্ষতা, ফর্ম, এই তিন ফ্যাক্টর বিপক্ষে চলে গেলে কিচ্ছু করার নেই। থামতেই হয় মহাতারকাকে। রোনাল্ডো, জিদানদের মতো যুগোত্তীর্ণ ফুটবলারদের কথা অবশ্য আলাদা। বিশ্বকাপ, ইউরো কাপ, কোপা আমেরিকা, চ্যাম্পিয়নস লিগ, ফিফার বর্ষসেরা। প্রাপ্তির ভাঁড়ার কানায়-কানায়, তবুও দেশের হয়ে সর্বস্ব নিংড়ে দিতে কার্পণ্য নেই এতটুকুও। বিশ্বকাপ এলেই তাই নতুন করে জেগে উঠতে সমস্যা হয় না এতটুকুও। দক্ষিণ আফ্রিকায় ব্রাজিল আর ফ্রান্সের ম্যাচ থাকলে জিজু আর রনকে খুঁজবেই ফুটবল দুনিয়া।

জিদান

জার্মানিতে এশীয় ফুটবলের দুই মহাতারকার একজন রইলেন উজ্জ্বল, অন্যজন ম্লান। কিন্তু সৌদি আরবের সামি-আল-জাবের আর ইরানের আলি দায়ি, দু'জনেই দাঁড়িয়ে কেরিয়ারের শেষ লগ্নে।

এই বিশ্বকাপটাই ওঁদের শেষ আন্তর্জাতিক আসর। তিউনিশিয়ার বিপক্ষে আল জাবেরের গোল ওঁকে পেলে-মারাদোনার সঙ্গে একাসনে বসিয়ে দিয়েছে। পরপর তিনটে বিশ্বকাপেই গোল করার কৃতিত্ব দুই কিংবদন্তি ছাড়া আর ছিল পশ্চিম জার্মানির উয়ে সিলারের। আফ্রিকান দেশটির বিপক্ষে গোল করে এখন সৌদির 'আইকন'ও ইতিহাসে। কিন্তু আল জাবেরের পাশে এবার সত্যিই বেশ অনুজ্জ্বল ইরান ফুটবলের ইতিহাসপুরুষ। দেশ প্রত্যাশামতোই ছিটকে গিয়েছে বিশ্বকাপের প্রথম রাউন্ড থেকে। হতাশ করেছেন জাতীয় দলের জার্সি গায়ে দেড়শোরও বেশি আন্তর্জাতিক গোলের মালিক। সাড়া জাগাতে পারেননি হিদেতোশি নাকাতা বা নাকামুরার মতো জাপ তারকারাও। চার বছর পর আলি দায়িদের মতো ওঁরাও তো থাকবেন না দক্ষিণ আফ্রিকায় এশিয়ার পতাকা বওয়ার জন্য।

আসলে সকলের ভাগ্য তো আর দিনো জাফ, লঁরা ব্লাঁ বা কার্লোস-দুঙ্গার মতো হয় না যে শেষ! বিশ্বকাপেও যে আলো জ্বালাবেন, ভিকট্রি পোডিয়ামে দাঁড়াবেন!

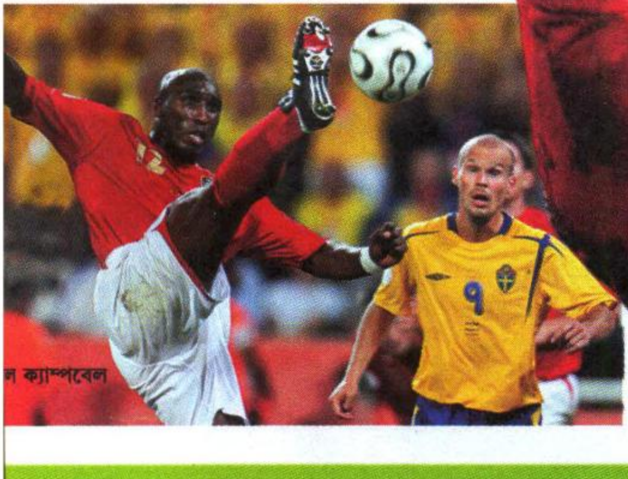

ল ক্যাম্পবেল

বেকহ্যাম

কি ক অ ফ

রোনাল্ডোর ১৪টি গোল্ডেন গোল

মেসি, বালাক নাকি রোনাল্ডিনহো, এবারে কে হবেন সেরা? অনেক জল্পনাকল্পনার শেষে উঠে এসেছে একটি নাম, রোনাল্ডো। বিশ্বকাপে যে তাঁরই সংগ্রহে ১৪টি গোল। লিখেছেন

অর্ঘ্য মুখোপাধ্যায়

"বল রোনাল্ডিনহোর পায়ে। রোনাল্ডিনহোর লম্বা ক্রস সিসিনহোর মাথায়। সিসিনহোর হেড...বল রোনাল্ডোর মাথায়, আর গোওওওওল...। গোলের সঙ্গে-সঙ্গে অনন্য এক বিশ্বরেকর্ডের অধিকারী হয়ে গেলেন রোনাল্ডো।" জার্মানিতে যদি বাঙালি ধারাভাষ্যকার থাকতেন, তা হলে ঠিক এমনই কিছু উচ্ছ্বাস শুনতে পেতাম। অবশেষে রোনাল্ডো নিজের জাত চেনালেন।' কিছুদিন আগেও সবাই 'রোনাল্ডো শেষ' বলে চিৎকার করছিল। জাপান ম্যাচের পর তাদের আর টিকি দেখা যাবে বলে মনে হয় না।

এতদিন পর্যন্ত পেলের সঙ্গে তিনিই ছিলেন বিশ্বকাপে ব্রাজিলিয় সর্বোচ্চ গোলদাতা। জাপানের বিরুদ্ধে প্রথম গোলের সঙ্গে-সঙ্গেই তিনি অতিক্রম করলেন ফুটবল সম্রাট পেলের বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ গোলের রেকর্ড এবং দ্বিতীয় গোলের সঙ্গে-সঙ্গে তিনি জার্মানির গার্ড মুলারের সঙ্গে যুগ্মভাবে বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ গোলদাতার সম্মান লাভ করলেন। রোনাল্ডো এবং মুলারের গোলসংখ্যা ১৪ এবং তাঁদের পরেই আছেন ফঁতে (১৩), পেলে (১২), ককসিস ও ক্লিন্সম্যান (১১)।

রোনাল্ডো এই নিয়ে চারবার বিশ্বকাপ খেলছেন, এর মধ্যে ১৯৯৪ বিশ্বকাপে তাঁকে রিজ়ার্ভ বেঞ্চে বসে খেলা উপভোগ করতে হয়েছিল। অর্থাৎ মাত্র দু'টি বিশ্বকাপেই তিনি ১২টি গোল করেছেন। তাঁকে নিয়ে সবচেয়ে মাতামাতি হয়েছিল ১৯৯৮ বিশ্বকাপে। যদিও এই বিশ্বকাপে তিনি আশানুরূপ খেলতে পারেননি। কিন্তু ২০০২ বিশ্বকাপে ব্রাজিলের কাপ জেতার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ভূমিকা গ্রহণ করেন তিনি। ক্লাব ফুটবলে তিনি চিরদিনই ভাল খেলেছেন। কিন্তু এবারের বিশ্বকাপে তিনি কেমন খেলবেন তা নিয়ে সংশয় সবারই ছিল এবং প্রথম দু'টো ম্যাচে তিনি কিছু করতেও পারেননি। শেষে জাপান ম্যাচে সমস্ত জল্পনাকল্পনার অবসান ঘটল। যদিও কেউ-কেউ তাঁর গোল দু'টির মান নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারে। এক্ষেত্রে উত্তর একটাই, ফুটবলে প্রথম ও শেষ কথাই হল, জালে বল ঢোকানো। এক্ষেত্রে আমাদের স্বীকার করতেই হবে, বক্সে রোনাল্ডো হলেন পৃথিবীর সবচেয়ে বিপজ্জনক স্ট্রাইকার।

আমরা অনেকেই ফুটবল সম্রাট পেলের খেলা দেখতে পাইনি, কিন্তু আমরা হয়তো পরবর্তী প্রজন্মের ফুটবলপ্রেমীদের গর্বের সঙ্গে বলতে পারব, "আমরা রোনাল্ডোর খেলা দেখেছি। তাই আমরা পেলের অভাব অনুভব করিনি।" না, তুলনা করছি না। কিন্তু পারফরম্যান্স যদি সেরা প্লেয়ারের সঠিক মাপকাঠি হয়, তা হলে সর্বকালের সেরা খেলোয়াড়দের মধ্যে রোনাল্ডো অন্যতম বলে বিবেচিত হবেন। যদিও বিশ্বকাপে রোনাল্ডোর খেলা এখনও শেষ হয়ে যায়নি, তাই কে বলতে পারে, হয়তো এখনও অনেক চমক অপেক্ষা করে আছে!

রোনাল্ডো: জাপানের বিরুদ্ধে প্রথম গোলের সঙ্গেই তিনি বিশ্বকাপে পেলের সর্বোচ্চ গোলের রেকর্ড অতিক্রম করে গেলেন

বাংলায় কম্পিউটারের বই
কৌশিক দত্ত ও সোমা রায়চৌধুরীর
প্রাথমিক কম্পিউটার শিক্ষা ১২৫
ওয়ার্ড ১২৫ এক্সেল ১২৫
পাওয়ারপয়েন্ট ৮০ ইন্টারনেট ৭৫
কোরেল ড্র ১২৫ পেজমেকার ৭৫
অ্যাডোব ফটোশপ ১৫০
স্কুলের পঞ্চম থেকে ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য অবশ্যপাঠ্য বই
সহজে শেখো কম্পিউটার
(১, ২, ৩, ৪)
অঞ্জলি প্রকাশনী
বিদ্যাসাগর টাওয়ার, শপ ১৬ (দোতলা)
১৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩
ফোন : ০৯৪৩৩৪২৮০৯১/০৯৪৩৩৪২৮০১৩
E-mail: anjaliprokashani@hotmail.com / @yahoo.co.in

প্রতিদিন এক ঘন্টাই যথেষ্ট।
6 লাখেরও বেশি মানুষ লাভবান হয়েছেন।
আর আপনি ?

শুধু বাংলা জানলেই চলবে

ইংরেজি

শিখুন
সহজেই ইংরেজি বলুন

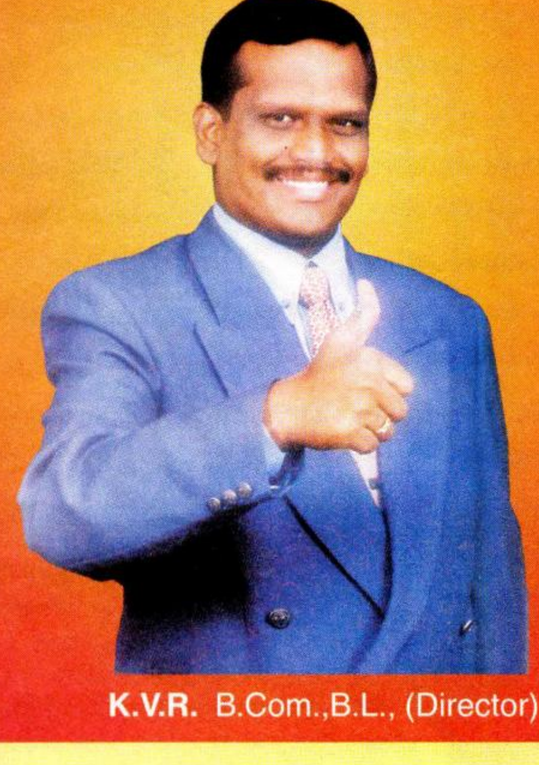

K.V.R. B.Com.,B.L., (Director)

আপনি আপনার ঘরে বসে অন্য কারুর সাহায্য ছাড়াই প্রতিদিন ১ ঘন্টা নিজে নিজে শিখলেই যথেষ্ট। আপনি সহজেই ইংরেজি শিখে নিতে পারবেন। আমাদের কোর্স বিশেষরূপে সোজা উদাহরণ সহযোগে সহজ ভাবে তৈরি। এই জন্য নিঃসন্দেহে আপনি ইংরেজিতে সহজেই কথা বলতে পারবেন। এই কোর্সের বর্তমান খরচ **500** টাকা। নীচের কুপন পূরণ করে আমাদের কাছে পাঠান। আপনার পোস্টম্যানের কাছে টাকা দিয়ে কোর্স নিয়ে নিন। এর পরে আর একটি কোর্স আছে যা চার মাসের কোর্স। এর খরচ অনেক কম, নামমাত্র। ইচ্ছে হলে এই কোর্স নিতে পারেন তবে তা বাধ্যতামূলক নয়।

বিনামূল্যে
১০০ টাকা মেমরি ইমপ্রুভমেন্ট কোর্স
(সহজ ইংরেজিতে)

6 লাখেরও বেশি মানুষের শেখা ইংরেজি কোর্স।

এক দিনের ইংরেজি প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করছেন কে.ভি.আর. (পুরস্কারবিজয়ী)

এই কুপন পূরণ করে পাঠান

3784

SINCE 1990

KVR INSTITUTE
AWARD WINNER

বিনামূল্যে
১০০ টাকা মেমরি ইমপ্রুভমেন্ট কোর্স (সহজ ইংরেজিতে)

New No.203(BEN), Habibullah Road, T.Nagar, Chennai - 600 017.

আমাকে কে.ভি.আর. (1 মাসের) ইংরেজি কোর্স এবং মেমরি ইমপ্রুভমেন্ট কোর্স ইত্যাদি ডাকে পাঠান। আমি পোস্টম্যানকে **500/-** টাকা দিয়ে দ্রুত বই সংগ্রহ করে নেব।

দ্রষ্টব্য : অনুগ্রহ করে আপনার ঠিকানা বড় হাতের ইংরেজি হরফে লিখুন।

Name: ....

Address: ....

....

.... Pin Code: ☐☐☐☐☐☐

* SERVICE TAX INCLUDED

ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ

বিশ্বকাপ ফুটবলের ফাইনাল যত এগিয়ে আসছে, ততই বড় হয়ে উঠছে প্রশ্নটা। কোন দেশ জিতবে এবারের বিশ্বকাপ? উত্তর পেতে অপেক্ষা করতে হবে আরও কয়েক দিন। তবে যে দলই চ্যাম্পিয়ন হোক, জিতে নেবে ২৪৫ লক্ষ সুইস ফ্রাঁ বা (প্রায় ৯২ কোটি টাকা) মূল্যের পুরস্কার। আর রানার্স দল পাবে ২২৫ লক্ষ সুইস ফ্রাঁ বা (প্রায় ৮৪ কোটি টাকা)। এই সঙ্গে ৯ জুলাই ফাইনালের পর বিজয়ী দলের অধিনায়কের হাতে উঠবে চিরশ্রেষ্ঠ ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ। ১৯৭০ সালে তিনবার বিশ্বকাপ জয়ের ফলে চিরদিনের জন্য জুলে রিমে কাপ জিতে নিয়েছিল ব্রাজিল। এরপর ১৯৭১ সালের ৫ এপ্রিল ফিফার বিশেষ কমিটি জমা পড়া ৫৩টি ডিজাইনের মধ্যে থেকে ইতালির মিলান শহরের শিল্পী সিলাভিও গাজানিগার ডিজাইনটিকে সেরা বলে বেছে নেয়। ৪.৯৭ কিলোগ্রাম ওজন এবং ৩৬ সেন্টিমিটার লম্বা কাপটি ১৮ ক্যারেট সোনা দিয়ে তৈরি। দু'জন অ্যাথলিট পিঠোপিঠি গোটা বিশ্বকে ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। ১৯৭৪ সালে নিজেদের দেশে হল্যান্ডকে হারিয়ে আজকের নতুন ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ প্রথম জিতেছিল এবারের আয়োজক দেশ জার্মানি।

হরিশঙ্করের চোখে স্বপ্ন

সিঙ্গাপুরের এশিয়ান অলস্টার সিট থেকে হাই জাম্পে দেশের হয়ে সেরা সাফল্য তুলে এনেছিলেন। ২০০৪ সালের ওই সাফল্যই হরিশঙ্কর রায়ের অ্যাথলিট জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল। জলপাইগুড়ির প্রত্যন্ত অঞ্চলের ছেলেটি ২.২৫ মিটার লাফিয়ে উঠে এসেছিলেন সংবাদের শিরোনামে। সম্প্রতি এশিয়ান গ্রাঁ প্রি-তে নেমে সাফল্য পেলেন তিনি। এই সাফল্যের পরই পিঙ্কি প্রামানিকের সঙ্গে হরিশঙ্করকেও আগামী এক বছরের জন্য দু' লক্ষ টাকা দিয়ে স্পনসর করল ই এস পি এন, স্টার স্পোর্টস। আসন্ন দোহা এশিয়াড এবং ২০০৮ সালের বেজিং অলিম্পিকের প্রস্তুতিতে ওই অর্থ খরচ করবেন তিনি। কলকাতার সাইয়ের কোচ সুভাষ সরকারের কাছে অনুশীলনে মেতে ওঠা হরিশঙ্করের চোখে এবার আরও বেশি উচ্চতা ছোঁয়ার স্বপ্ন।

নাকাতার ফুটবল কাফে

বিশ্বকাপ শুরুর আগেই দেশের ফুটবল সমর্থকদের জন্য একটি ফুটবল কাফে খুলেছেন জাপানের তারকা ফুটবলার হিদেতোশি নাকাতা। সমর্থকরা যাতে তাদের প্রিয় ফুটবলারদের জন্য গলা ফাটাতে পারেন, তারই জন্য এই কাফের ব্যবস্থা। এখানে বসেই সমর্থকরা জায়ান্ট স্ক্রিনে বিশ্বকাপের খেলাগুলো দেখার সুযোগ পাচ্ছেন। সঙ্গে আছে খাওয়াদাওয়ার আয়োজন। তবে এবারের বিশ্বকাপে জাপানের শুরুটা একেবারেই ভাল হয়নি। তার আগে দলের পারফরম্যান্স নিয়ে প্রকাশ্যে হতাশা প্রকাশ করে স্বয়ং নাকাতাই কোচ জিকোর বিরাগভাজন হয়েছেন। দেশের ফুটবল সমর্থকরা এখন নাকাতার ফুটবল কাফেতে কতটা ভিড় জমাচ্ছে কে জানে!

দলবদল নিয়ে নাটক

বিশ্বকাপ ফুটবলের উন্মাদনার মধ্যে কলকাতা ফুটবলের দলবদলকে ঘিরেও ফিরে এল সত্তর দশকের উত্তেজনা। নতুন মরশুমে ফুটবলার রহিম নবি মহমেডান দলে খেলবেন বলে ক্লাব কর্তাদের আশ্বাস দিয়েছিলেন। মহমেডানের দাবি অনুযায়ী পাঁচ লক্ষ টাকা নাকি অগ্রিমও নিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু হঠাৎই অজ্ঞাতবাস থেকে বেরিয়ে এসে নাটকীয়ভাবে ইস্টবেঙ্গলের হয়ে সই করে দেওয়ায় ঘরোয়া ফুটবলের দলবদলে ফিরে আসে উত্তেজনা। দু' দলের হুমকি পালটা হুমকি, পুলিশের উপস্থিতিতে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ময়দান। তবে সই শেষ করে নবি পুলিশি প্রহরায় আই এফ এ অফিস ছাড়লেও, সই-বিতর্ক না মেটায় শেষ হাসি হাসতে পারেননি কেউই।

খেলা নিয়ে জমাটি খেলা

এবারের বিশ্বকাপের প্রথম দিন থেকেই চালু হয়েছে এই অভিনব খেলা। বিশ্বকাপের প্রতিটি ম্যাচের ফলাফল নিয়ে সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারলেই জিতে নেওয়া যাচ্ছে পুরস্কার। প্রতিটি ম্যাচের শেষ বাঁশি বাজার আগে পর্যন্ত কী হতে পারে সেই ম্যাচের ফলাফল, কোন দল ক'টা গোল করবে, এমন সব বিষয় ৫৫৭৭ নম্বরে এস এম এস পাঠিয়ে বা www. ontrackindia.com ওয়েব সাইটের মাধ্যমে ভবিষ্যদ্বাণী করে পয়েন্ট সংগ্রহ করতে হবে। পরে সেই পয়েন্টের ভিত্তিতেই একজন প্রতিযোগী জিতে নেবেন এক হাজার টাকার গিফ্ট ভাউচার। এই খেলায় কোনও এন্ট্রি ফি নেই। বিশ্বকাপকে সাধারণের কাছে আরও বেশি উপভোগ্য করে তুলতেই এই আয়োজন করেছে অন ট্র্যাক সিস্টেম লিমিটেড। শুধু বিশ্বকাপ ফুটবলই নয়। এর পর কলকাতা ফুটবল লিগ, এশিয়াড এবং বিশ্বকাপ ক্রিকেট নিয়েও এমন খেলার আয়োজন হবে।

চন্দন রুদ্র

কথা হল ত্বকের সুরক্ষার...
তাও আবার শুধু সাবান দিয়ে?
IPSA
Eraser™
Herby Scrub
PREMIUM SOAP
FOR GENTLE, FAIR & FLAWLESS SKIN
3-in-1
Moisturizer+Scrub+Soap
• Scrub of Neem, Khas, Manjistha & Almond - removes dead cells without harming skin.
• Aloevera & Cucumber - moisturizes and nourishes the skin.
• Acts as a deodorant & keep you fresh throughout the day.
Eraser
এই না হল কথা!
Eraser Skin Care Range
• Eraser P.A.:- The only 100% Antimarks cream - Removes Scar naturally • Eraser Ultra Fair:- An Ayurvedic fairness cream
• Eraser Herby Cool:- Prickly Heat Powder • Eraser Plus:- Anti Marks + Fairness Cream • Eraser Face Wash • Eraser Face Scrub
• Eraser Foot Cure:- For Curing of cracked feet • Eraser Acne & Pimple:- Natural Treatment for Acne & Pimple • Eraser Dry Face Pack
• Eraser Boro Aloe:- An Ayurvedic Antiseptic Cream - Say Bye-Bye to dry skin • Eraser Wet Face Pack:- For Fairness & Wrinkle free skin
NIYATI

ANANDAMELA JULY 2006 REGD. NOS. SSRM/KOL RMS/WB/RNP-236/2004-06 & SSRM/KOL RMS/WB/RNP-236/FGN-20/2004-06 RNI NO. 27057/75 LPWP NOS. SSRM/Kol RMS/WB/RNP-235/LPWP-19/2004-06 & SSRM/Kol RMS/WB/RNP-235/FGN-06/LPWP-FGN-02/2004-06 INR 10.00

বেশী পুষ্টিকর হলেই তা সবসময় সুস্বাদু নাও হতে পারে।

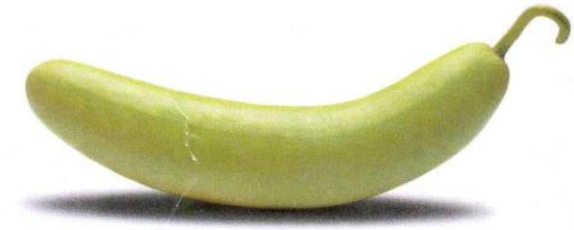

কিন্তু কখনো কখনো আপনার ভাগ্য খুলে যেতে পারে...

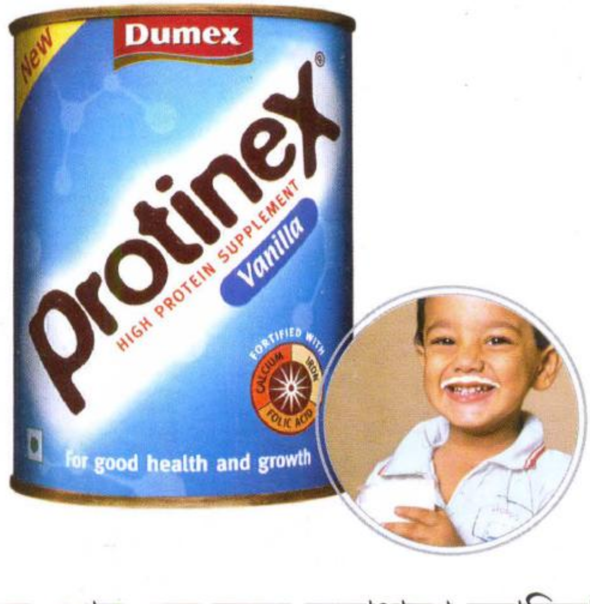

LOWE VAN SAN BEN 014

পুষ্টিকর প্রোটিনেক্স এখন এক নতুন অসাধারণ ভ্যানিলা স্বাদে।

প্রোটিনেক্স, ক্ষ একটি আস্থাপূর্ণ উচ্চ প্রোটিন সম্পূরক, এখন এসে গেল এক নতুন ভ্যানিলার স্বাদে। প্রোটিনেক্স ভ্যানিলা শুধু উচ্চ প্রোটিনযুক্তই নয়, এতে আয়রণ, ফলিক অ্যাসিড এবং ক্যালশিয়ামের মত সমস্ত অত্যাবশ্যক ভিটামিন ও মিনারেলও যুক্ত আছে।

বেশীর ভাগ সময়েই, আপনার শরীরকে সুস্থ্য এবং প্রাণচঞ্চল রাখার জন্য যতটা প্রোটিন আপনার প্রয়োজন আর যতটা প্রোটিন আপনি আপনার দৈনন্দিন জীবনের খাবার থেকে পান, এই দুয়ের মধ্যে একটি বিরাট ফাঁক বা অভাব থেকে যায়। এই "প্রোটিনের অভাব"-এর কারণেই বারবার ক্লান্তি এবং দুর্বলতার অনুভূতি হয়। নতুন প্রোটিনেক্স ভ্যানিলার দ্বারা এই "প্রোটিনের অভাব"-কে পূর্ণ করুন। প্রতিদিন মাত্র 2 কাপ প্রোটিনেক্স ভ্যানিলা আপনার পরিবারের প্রোটিনের প্রয়োজনীয়তা পূর্ণ করে দেবে।

আপনার পরিবারকে দিন প্রোটিনেক্সের লাভ!

প্রোটিন প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিস্তৃত ভাবে জানবার জন্য আপনার ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন।

আমাদের এই ঠিকানায় লিখুন, ড্যুমেক্স সায়েন্সেজ, পো.অ. বক্স 12, গুড়গাঁও 122002, অথবা আমাদের সঙ্গে www.youngnutritionindia.com-তে যোগাযোগ করুন।